তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান

দীপক কুমার রায়
অরুণা চৌধুরী

অরুণা চৌধুরী
বি. এ. ডিপ. লিব. (প্রথম শ্রেণী, কলিকাতা)।

শ্রীমতী চৌধুরী দীর্ঘ ২৮ বছর যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সহযোগী গ্রন্থগারিক রূপে তথ্য পরিসেবায় রত আছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদের এর আজীবন সদস্যা শ্রীমতি চৌধুরী কমপিউটার বিষয়ে প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালের বাইরেও তাঁর আর এক জগৎ আছে তা সঙ্গীতের জগৎ, শিল্পের জগৎ। গীতবিতানে এর 'গীত ভারতী' উপাধি প্রাপ্তা শ্রীমতি চৌধুরী দীর্ঘ আঠারো বছর আকাশবানী কলিকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী।

তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান

—তাত্ত্বিক আলোচনা—

দীপক কুমার রায় এম. এ., পি. জি. ডিপ. লিব. (কলি), এম. এল আই. এস (বর্ধ)

সহযোগী গ্রন্থাগারিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

অরুণা চৌধুরী পি. জি. ডিপ. লিব. (কলি)

সহযোগী গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞান অন্বেষণ

কলিকাতা-৭০০০৩৭

Tatthya Vittik Samaj O Tatthya Biggyan.

- দীপক কুমার রায়
- অরুণা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ ঃ—১৫ আগষ্ট ১৯৯০

প্রকাশক ঃ
বি. ডি. চৌধুরী
জ্ঞান অন্বেষণ
১/১১ পাইকপাড়া রো
কলিকাতা-৭০০০৩৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
বি. ডি. চৌধুরী

মুদ্রাকর ঃ
কম্পোজিং সেণ্টার
১৪/১, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ষাট টাকা।

উৎসর্গপত্র

৺সুবোধ কুমার রায়
শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়

বাবা ও মাকে শ্রদ্ধার্ঘ

—দীপক

৺রেবতী রঞ্জন চৌধুরী
শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী

বাবা ও মাকে শ্রদ্ধার্ঘ

—অরুণা

মুখবন্ধ

শ্রীদীপক কুমার রায় ও শ্রীমতী অরুণা চৌধুরী তাঁদের 'তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান' গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখে দেবার অনুরোধ করেছিলেন এবং আমি সানন্দে সে কাজে রাজী হয়েছি। এরা তথ্যভিত্তিক সমাজকে বিশ্লেষণ করে তথ্যবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা ও বিভিন্ন দিক নিয়ে যে ভাবে আলোচনা করেছেন তাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। কারণ মাতৃভাষায় ঠিক এই ধরণের তথ্যবিজ্ঞান চর্চা বড় বেশী চোখে পড়ে না। সম্ভবতঃ এ জাতীয় গ্রন্থ এরাই প্রথম লিখলেন। সর্বস্তরে মাতৃভাষা চালু করার ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকার বদ্ধ। কিন্তু মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট স্তরের গ্রন্থাদি প্রণীত না হলে কি ভাবে আমরা সে অঙ্গীকার পালন করব। লেখকদ্বয় তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞানের বেশ কিছু আংশিক জানা ও প্রায় অজানা ও অনালোচিত বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা করে যথার্থই সকলের কাছে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য হয়েছেন। শ্রীরায় ও শ্রীমতি চৌধুরী বেশ দক্ষতার সঙ্গেই তাদের বিষয় বস্তুর উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প রূপায়নে সমর্থ হয়েছেন। এ সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের সুদীর্ঘ দিনের তথ্য পরিসেবার কাজে অভিজ্ঞতা। আমার দৃঢ় ধারণা এই গ্রন্থটি তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের ও গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ উপকারে আসবে।

শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী
এম. এ. ডিপ. লিব., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। অতিথি অধ্যাপক, কলিকাতা ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবেদন

"তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান ঃ তাত্ত্বিক আলোচনা" গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এযাবৎ কিছু তথ্যবিজ্ঞানী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথা তথ্যবিজ্ঞান নিয়ে কিছু বাংলা গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, তথ্যভিত্তিক সমাজকে বাদ দিয়ে তথ্যবিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সঠিক পরিভাষার অভাবে ইংরাজী ও বাংলা শব্দের যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে। তথ্য বিজ্ঞানের বাংলা বইয়ের এত অভাব যে সঠিক পরিভাষার জন্য অপেক্ষায় থাকলে অনন্তকাল কেটে যাবে। স্বভাবতই অধিকাংশ অধ্যায় লেখার ব্যাপারে আমরা ইংরাজী ভাষায় পরিবেশিত নথি ও তথ্যের উপর নির্ভর করেছি এবং প্রয়োজন বোধে প্রচলিত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেও বিষয়কে সহজবোধ্য এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এখন গ্রন্থটি শিক্ষার্থী বা তথ্যবিজ্ঞানীদের কাজে লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করব।

এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কেমন করে তথ্যভিত্তিক সমাজের উদ্ভব হয়েছে এবং আধুনিক সমাজ বলতে আমরা কোন ধরণের সমাজকে বুঝি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যার কতটা প্রভাব পড়েছে। যদি এ সমাজ তথ্যভিত্তিক হয়ে থাকে তবে, তথ্য ব্যবহার-কারীর চাহিদা নির্ধারণ করবার প্রক্রিয়া কি রূপ। কেমন করে ডকুমেন্টেশন ও তথ্যবিজ্ঞানে সম্পর্ক নির্ধারণ করা যাবে। বিষয়বস্তুর জগতকে যদি আলোচনা না করা যায় তবে তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা অপরিণত থেকে যাবে। বিষয়বস্তুর জগত ও তথ্যবিজ্ঞান একটা অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থাগাররূপী তথ্যকেন্দ্র তথ্য পরিবেশনে কোন ভূমিকা পালন করবে তা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যের উৎস স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। নানা ধরণের তথ্য পরিবেশনের ও সংগঠনের ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্য সি. এ. এস সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। তথ্যের খবর সঠিকভাবে দিতে গেলে তথ্য

নির্দ্দেশক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই তথ্য নির্দ্দেশক প্রক্রিয়া এবং তথ্য উদ্ধারের মৌলিক দিক নিয়ে যথাযথভাবে আমরা আলোচনা করেছি। একথা ঠিক যে, Citation নির্দ্দেশক বা দৃষ্টান্ত স্বরূপ নির্দ্দেশক সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তথ্যকর্মীর পক্ষে গবেষণাকাজে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তাই এই বিষয়ের আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

তথ্যপঞ্জী পরিমাপক, তথ্যকেন্দ্রে সিসটেমস্ এনালিসিস্, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য স্থাতান্তরণ এবং তথ্য পরিসেবায় রেপ্রোগ্রাফীর ভূমিকা আলোচনা না করলে এ জাতীয় গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকে। জানিনা বাংলা ভাষায় এ ধরণের আলোচনা অন্য কোন তথ্য বিজ্ঞানের গ্রন্থে পূর্বে হয়েছে কিনা। কমপিউটারের আকৃতি এবং তথ্য বিজ্ঞানে তার পরিধি এবং কিউ পদ্ধতির মত একটি জটিল তত্ত্বকে পরিবেশন করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছি। এ কাজের সার্থকতা পাঠকসাধারণেরই বিবেচ্য। শেষ অধ্যায়ে তথ্যবিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে গড়ে উঠেছে গ্রন্হটির বর্তমান অবয়ব।

'জ্ঞান অন্বেষণের' কর্ণধার শ্রী বি. ডি. চৌধুরী গ্রন্হটি লেখার ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত না করলে এত দ্রুত গ্রন্হটি প্রকাশ করা সম্ভব হোতো না। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টাকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

বিখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্হাগারিক ডঃ অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী, তথ্য বিজ্ঞানী অলোক মিত্র (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুশীল চ্যাটার্জী (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), তথ্যবিজ্ঞানী দিলীপকুমার রায় (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালর), তথ্য বিজ্ঞানী ভবানী ঘোষ, তথ্যবিজ্ঞানী অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, তথ্যবিজ্ঞানী আশাচৌধুরী, গৌরী বন্দোপাধ্যায় ও তথ্যবিজ্ঞানী প্রীতিমিত্রকে সাধুবাদ জানাই কারণ তারা গ্রন্হটি লেখার ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্পনা ভট্টাচার্য্য, মলি ভট্টাচার্য্য, রিঙ্কু রায়, ও মিমি চৌধুরীকেও জানাই ধন্যবাদ কারণ তারা আমাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী মহাশয়কে যিনি গ্রন্হটির মুখবন্ধ লিখেছেন। সর্বশেষে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা—দীপককুমার রায় ও অরুণা চৌধুরী।

প্রকাশকের নিবেদন

তথ্যবিজ্ঞান তথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ বিশেষ নেই। আর 'তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্যবিজ্ঞান'—এই জাতীয় গ্রন্থ একটিও আছে কিনা জানি না।

গ্রন্থাগার বা তথ্যবিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশের একটা সুপ্ত ইচ্ছা আমাদের বরাবরই ছিল এবং ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিষ্ঠান দু'একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং তা শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে সমাদৃতও হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে তথ্যবিজ্ঞানের জটীল দিকগুলি সহজ করে বলতে চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকারদ্বয়। এ যাবৎ এই বিষয়টির জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের একমাত্র বিদেশী বইয়ের উপর নির্ভর করতে হোতো।

এখন যদি গ্রন্থটি শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের কাজে লাগে তবেই গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু কিছু ভুলত্রুটী থাকা সম্ভব। সেজন্য আমরা দুঃখিত।

গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে লেখক ও লেখিকা শ্রীদীপক কুমার রায় এবং শ্রীমতি অরুণা চৌধুরী যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়েছেন তার জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা
২৫শে জুলাই ১৯৯০

বি. ডি. চৌধুরী
প্রকাশক

সূচীপত্র

১।	তথ্যভিত্তিক সমাজ	...	১
২।	সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব	...	১৩
৩।	তথ্যভিত্তিক সমাজ ও তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদা	...	১৯
৪।	তথ্যবিজ্ঞান ও ডকুমেণ্টেশনের সম্পর্ক	...	২৪
৫।	বিষয়বস্তুর জগত ও তথ্যবিজ্ঞান	...	৩২
৬।	তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা	...	৩৬
৭।	তথ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা	...	৪২
৮।	বিভিন্ন ধরণের তথ্য পরিবেশনের ও সংগঠনের প্রক্রিয়া **C.A.S. =(Current Awarness Service)**	...	৪৫
৯।	তথ্য পরিসেবায় নির্দ্দেশক প্রক্রিয়া	...	৪৯
১০।	তথ্য উদ্ধারের মৌলিক দিক	...	৬৪
১১।	দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখিত নির্দ্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি কথা	...	৬৯
১২।	তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ও তথ্যবিজ্ঞান	...	৭৬
১৩।	তথ্যকেন্দ্রে সিসটেমস্ এনালিসিস	...	৮৪
১৪।	তথ্য বিজ্ঞানে মান নির্ণয়ের ভূমিকা	...	৯৩
১৫।	কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য স্থানান্তরণ	...	৯৭
১৬।	তথ্য পরিসেবায় রেপ্রোগ্রাফী একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ	...	১০৩
১৭।	কমপিউটারের ক্রমবিকাশ ও প্রজন্ম	...	১০৯
১৮।	কমপিউটার ঃ তার আকৃতি এবং তথ্য বিজ্ঞানে তার পরিধি	...	১১৬
১৯।	কিউয়িং পদ্ধতি	...	১২২
২০।	তথ্য বিজ্ঞানের টুকিটাকি	...	১৩৩
২১।	পরিশিষ্ট ক	...	১৪৫
২২।	পরিশিষ্ট খ	...	১৪৮

প্রথম অধ্যায়

তথ্যভিত্তিক সমাজ

আধুনিক সমাজ তথ্যভিত্তিক সমাজ। আমাদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে তথ্য, তবে সেটা আজ নয়, তা সুরু হয়েছিল যেদিন মানুষ সভ্যতার আলো দেখতে আরম্ভ করেছে সেদিন থেকে। তখন মানুষ বুঝত না যে তারা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের বিকশিত করছে। আমাদের ধারণা শৈশবে পিতামাতা আমাদের জীবনে প্রথম তথ্যবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন। একটা সময় ছিল, যখন ধর্মগুরুরাও তথ্য দিয়ে শিষ্যদের জীবনকে পরিচালিত করতেন। যেমন বুদ্ধ, যীশু, হজরত, শংকরাচার্য—এরা নানা তথ্য দিয়ে শিশুদের মনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতেন। কিন্তু তাহলে আমরা কেন বলছি, আধুনিক সমাজ তথ্য-ভিত্তিক ? কারণ অতীতে যেভাবে তথ্য সমাজকে প্রভাবিত করেছিল তা ছিল পুরোটাই অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকে দেখা গেল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেভাবে বিস্তারিত হচ্ছে তাতে বিভিন্ন ধরনের নথি তাদের বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে মানুষের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে।

প্রাচীনযুগে বা মধ্যযুগে যে ধরণের তথ্যে সমাজের রূপরেখা দেখা গিয়েছিল, আধুনিক যুগে তার খোল নলচে পালটে গেল। তাই চল্লিশের দশকে দেখতে পেলাম মানুষের জ্ঞানের সীমিত অবস্থাকে একেবারে জ্ঞান-বিস্ফোরকের অবস্থায় নিয়ে গেল। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। সেই সঙ্গে মানবিক চিন্তায় ভরপুর তথ্য তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হতে শুরু করেছে। এক কথায় বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন মানব সভ্যতার শত্রুরূপে দেখা দিয়েছিল, এবং ধ্বংস করেছিল বহু গ্রাম, নগর—তেমনি সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছিল বহু নতুন জ্ঞান যার সৃজনশীল ভূমিকা মানব সভ্যতাকে নতুর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুত সেই সময় থেকেই তথ্যভিত্তিক সমাজের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সত্তরের দশক থেকেই দেখা গেল তথ্যভিত্তিক সমাজ কথাটি তথ্য-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার শুরু করেছেন। বস্তুতঃ উন্নত দেশগুলোতে তথ্য বিস্তারে কম্পিউটার সমাজ-জীবনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করতে শুরু করেছে।

এখন দেখা যাক, তথ্যভিত্তিক সমাজ কাকে বলে? তথ্যভিত্তিক সমাজ হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে শ্রমের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার। আর এই শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিক তার রুজী-রোজগার করছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কথাটা কিছুটা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মনে হচ্ছে। তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাকরীর সুযোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে যা পূর্বে ছিল না। সেদিক থেকে প্রচলিত শিল্পগুলোতে যে জড়ত্ব বা বন্ধ্যা দশা চলছে, তার থেকে তথ্যবিজ্ঞানীদের অবস্থা অনেক ভালো। শীঘ্রই তথ্যবিজ্ঞানীদের বিভিন্নভাবে নামকরণ হচ্ছে যেমন—তথ্যকর্মী, তথ্য বাস্তুকার, ধারণার বিবরণ প্রস্তুতকারী, চিহ্ন ম্যানিপিউলেটর (**manipulator**) প্রভৃতি। আমরা জানি একসময় কতকগুলো নাম সাধারণ মানুষের নিকট খুবই প্রচলিত ছিল, যেমন তাঁতি, গাড়ী নির্মাতা, যাঁতাকলের মালিক বা চালক প্রভৃতি। ইউ. এস ব্যুরো অফ লেবার (**U. S. Bureau of Labour**) সম্প্রতি সাদা কালারের (**white coloured**) কর্মীদের তথ্যকর্মী বলে অভিহিত করেছে।

বস্তুতঃ তথ্যভিত্তিক সমাজ একটি যুগকে অতিক্রম করতে চলেছে। মানুষের জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হয় ঠিক তাকেই আমাদের রক্ষা করে যেতে হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ তথ্য পরিকল্পনাও আমাদের তথ্য জগতের চলমানতার উপর নির্ভর করে। আগামী দিনের রূপরেখা বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতি-বিদদের বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তথ্যবিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে নতুন বিশ্লেষণগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরা।

নামের পরিভাষার অভিনবত্ব :

আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে তথ্যবিজ্ঞানীদের কাছে পরিভাষাগত অভিনবত্ব স্থান কাল পাত্র অতিক্রম করে গেছে। টোফারের (**Toffer**) মতে পরিবর্ত্তনের তিনটি ধারা যেমন—কৃষি, শিল্প এবং তথ্যবিপ্লব। এইগুলো পরিভাষাগত অভিনবত্বের জন্য দায়ী, এগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বরং একটি অপরের সঙ্গে যুক্ত। যদিও পরিবর্ত্তন পৃথিবীর সব স্থানে সমান নেই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্নতার জন্য অনেক স্থানে তথ্যবিপ্লবের গতিপ্রকৃতি বিঘ্নিত হয়েছে বা স্তব্ধ হয়েছে।

মানবজীবনের অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। টোফার (Toffer) যে তিনটি ধারার ও ওয়েভের উল্লেখ করেছেন তা সবসময়

মেলে না কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকৃতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার মধ্যে তার সার্থকতা নির্ভর করে।

মানবজীবনের মূলে যে গতি প্রবাহ বয়ে চলেছে তাকে অর্থনৈতিক বিশারদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষকরা তাদের আলোচনার মধ্যে বিবর্তনশীল করে রেখেছেন। ১৯২০ সালে রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ কন্ড্রাটিফ (Kondratieff) তার ব্যাটারি (Battery । নির্দেশক যন্ত্রবিশেষ দিয়ে দেখিয়েছেন ১৮৮০ থেকে ৫৪ বৎসর ধরে টোফার (Toffer) যে তিন ওয়েভ বা প্রবাহের কথা বলেছেন তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যেমন দিনকে রাত অনুসরণ করে ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সময় অনুযায়ী গতি এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি একে অন্যকে অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে যারা নতুন নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তারা হলেন যুগলার (Juglar) স্নুমপিটার (Schumpter), কিচেন (Ki:hen) এবং ভেন ডুয়ান (Ven Duijn). তাদের মতে অর্থনীতির আবিস্কৃত মৌলিক উপাদানগুলির ব্যবহার উন্নত দেশগুলিতে অনেক উন্নতমানের পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনুন্নত বা উন্নতিকামী দেশগুলিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এইগুলির গতি-প্রকৃতি নিম্নাভিমুখী। অর্থনৈতিকভাবে একটি ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্যটির কমে যাওয়া বা বিপরীতধর্মী হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও গবেষণার মান। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে উন্নত দেশগুলো অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং উন্নতিকামী ও অনুন্নত দেশগুলোর কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাদের পশ্চাদপসরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও নব নব আবিস্কার উন্নত দেশগুলোকে করেছে সমৃদ্ধ। অথচ মানব সম্পদ, কাঁচামাল প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতিশীল দেশে তেমন জোরদার ভাবে কর্মকান্ড হচ্ছে না বলেই তারা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক পেছিয়ে আছে। এছাড়া রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আদর্শের সংকট। টোফার (Toffer) বিভিন্ন দেশের উন্নতির মূলে যে তিনটি ধারা বা ওয়েভ দেখিয়েছেন তার মধ্যে তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা হচ্ছে তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব। অর্থাৎ তথ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে

কম্পিউটারের আগমন, বিশেষ করে মাইক্রোপ্রসেসরকে (Microprocessor) অবলম্বন করে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে উৎপন্ন সামগ্রীর যে সমৃদ্ধি ঘটছে তা অভূতপূর্ব। যাইহোক এটি ভুল হবে যদি আমরা টোফারের (Toffer) তৃতীয় ওয়েভ বা প্রবাহকে, যাকে তিনি বলেছেন তথ্য বিপ্লব, তাকে আমরা শুধুমাত্র কম্পিউটার বিপ্লবের মধ্যে আবদ্ধ রাখি। সন্দেহ নেই কম্পিউটার তথ্য বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখা দরকার কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কজাত প্রতিভার বিকল্প নয়। মানুষ যখন তার উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে নতুন আবিস্কার দিয়ে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে তখন কম্পিউটার তা তড়িৎ গতিতে ব্যাপকতম মানুষের কাছে পেঁছে দিতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আধুনিক যুগের যে তথ্যভিত্তিক সমাজ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হচ্ছে কম্পিউটার তাকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কম্পিউটার আজ মানবজীবনে নানা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে। উন্নতদেশে তাই কম্পিউটারের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

আসল কথা হচ্ছে, নামের পরিভাষার ব্যাপারটি এখানে গৌণ; বরং নব নব আবিস্কারগুলোকে সঠিকভাবে বোঝানো এবং তাকে কেমন করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যাবে, সেটাই মুখ্য ব্যাপার। এর ফলে সমাজের যে মৌলিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে, যেটা টোফার (Toffer) এবং অন্যান্যরা বলতে চেয়েছেন সেটাই আমাদের অনুধাবন করতে হবে। নামের পরিভাষা নিয়ে আমাদের খুববেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যদিও আগেই বলেছি যে ব্যাপক ভাবে তথ্যভিত্তিক সমাজ সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি আরও পেছনের দিকে তাকাই তবে দেখব ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে তথ্যসমাজ বা তথ্যভিত্তিক সমাজ কথাগুলো উন্নত দেশগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সত্তরের দশকেই এ শব্দটির বহুপ্রচলন ঘটেছে। এ সময় থেকেই তথ্য সমাজের সম্পর্কে যে কথাগুলো লাল অক্ষরে লেখা হচ্ছিল তা হল, তথ্যযুগ, মাইক্রোমিলিনিয়াম, শিল্পসমাজের পরবর্ত্তীধাপ (Post Industrial Society), কমপিউটার বিল্পব, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ (knowledge Society), তথ্যমণ্ডল (Inosphere) সেবামূলক সমাজ (Service Society) সুচিন্তিত সমাজ বা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সমাজ (Leisure Society), প্রকর্মী সমাজ

(Technotronic Society) পদার্থ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগ (Electronic age) অর্থাৎ যে যুগ দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত একটি সমাজের উপর।

উপরোক্ত নামকরণগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় এগুলোর মূলবিষয় তথ্য সমাজ বা তথ্য ভিত্তিক সমাজের অর্থের মধ্যে যে বিশালতা রয়েছে তাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। আসলে এগুলো এক কথায় বিভিন্ন নামের সমষ্টি। এযেন শ্রীকৃষ্ণের শতনাম।

তথ্যবিস্ফোরণ : তথ্যভিত্তিক সমাজ কথাটি ব্যবহৃত হবার বহুপূর্বেই বহু লেখক বা তথ্যবিজ্ঞানী এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তথ্য বিজ্ঞানী ডেরেক ডি সোল্লা প্রাইস (Derek de Solla Price) ইনি বিজ্ঞানের ক্রমিক বৃদ্ধি আকৃতি এবং বিজ্ঞানের সংগঠনের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। প্রাইস (Price), বিজ্ঞানী কেমন করে মানুষের জীবনে স্থান করে নিচ্ছে সে বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৬৫ সাল থেকে সারা বিশ্বে বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রপত্রিকা (Periodicals) ক্রমবর্দ্ধমান এবং দ্রুতগতিতে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি এও দেখলেন যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশনা একলক্ষ অতিক্রম করে গেছে। এমন সংখ্যায় এগুলো পেঁছুতে আরম্ভ করল যা প্রাকৃতিগত সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে ১৮৩০ সালের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের ধারণা ছিল বেশ কিছু অবাস্তব চিন্তা। কোন বিজ্ঞানী সমস্ত বিষয়ের জার্নাল বা সাময়িক পত্রপত্রিকার অধিকাংশই দেখবার সুযোগ পেতেন না। অথচ Price এর মতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো বিজ্ঞানীদের নিকট পেঁছে দেবারও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম তখনও গড়ে ওঠেনি।

Price আরো লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানবসম্পদ কেমন করে বাড়তে লাগল এবং সেখানেও তিনি দেখান অসদৃশ ছবি। তিনি একথা স্পষ্ট করেই বললেন এসব বিজ্ঞানীদের ৮০% থেকে ৯০% জানেনই না কুড়ি বছর আগেও কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ওপর লেখা বেরিয়েছে। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বললেন, আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এমন পর্য্যায়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি

পরুষের, নারীর, শিশুর এবং প্রতিটি কুকুটের পেছনে কাজ করবার জন্য ডজন ডজন বৈজ্ঞানিক নিয়োজিত হবে। একথার মূল অর্থ এই দাঁড়ায় যে বিজ্ঞানের বিষয় গুলোর অসংখ্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং তা খানিকটা অবাস্তব ভাবেই ঘটবে।

বিজ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণের (Scientometrics) বিষয়ে Derek de Solla Price প্রতিষ্ঠিত-বিজ্ঞানীর পিতারূপে পরিচিত। তিনি প্রথম বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গতিকে একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় নিয়ে এসেছেন এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে বিশাল বিজ্ঞানের (Big Sciences) প্রয়োজনের আধিক্যের অংশগুলোকে। তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে মূল রোগ তা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রোগের মধ্যে একটি বিজ্ঞানের বিষয় প্রকাশনার অতিরিক্ত প্রাচুর্য বা প্রয়োজনের আধিক্য যাকে ইংরাজীতে বলে Superabundance of Literature. এই রোগনিরূপণ আজকে আরো কঠিন হয়ে পড়েছে যা Price-এর আমলে লক্ষিত হয়েছে বা Price যা নিরূপণ করেছিলেন। বিজ্ঞান বহুদিন ধরে যেভাবে ক্রমবর্ধমান ভাবে তার বিভাগগুলোকে বিস্তারিত করে চলেছে এবং যেভাবে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রকাশনা বেড়ে চলেছে তাতে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। যতই তথ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতি বা উন্নতি ঘটাই না কেন, আধুনিক তথ্য সমাযোজন ব্যবস্থা বা তথ্য লেনদেন ব্যবস্থাকে উন্নত অবস্থায় (Sophistication of information and communication technologies) নিয়ে যাই না কেন তবুও বিজ্ঞান বিষয়ের যে বিস্ফোরণ আজ দেখা যাচ্ছে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বে এনে তা পাঠক সাধারণের হাতে সঠিক সময়ে সম্পূর্ণ তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে (Post war) বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘটেছে। আজ বিজ্ঞানের বিশালতা (Big Science) সঠিকভাবে পরিচালনা করে, সংগঠিত করে মানুষের আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা নানাভাবে চলছে। তথ্য-সংগ্রহ ও তার ব্যাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে উন্নত পর্যায়ে যাবার জন্য প্রয়োজন কম্পিউটারকে কাজে লাগানো (Computer based information storage

and retrieval system) এবং তাহলে আমরা কিছুটা 'বিগ সায়েন্সের' (Big science) তথ্যের সরবরাহতে যে ষে কৈশোর অবস্থা রয়েছে তা কিছুটা কাটাতে সক্ষম হব এবং বিজ্ঞান বিষয়ক রোগেরও কিছু উপশম করা সম্ভব। বিজ্ঞানের যে ক্রমবর্ধমান কণিকাগুলো বেড়ে চলেছে সেগুলো সঠিকভাবে খুঁজে বের করে বা উদ্ধার করে গবেষণার কাজে লাগাতে হবে। এই কাজে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে লাগানো দরকার। বিশেষতঃ গবেষণার স্বার্থে স্বাভাবিক ভাবেই কম্পিউটারকে কাজে লাগাতে হবে (Computarised processing of information). কম্পিউটারের ব্যাপারে এক্ষেত্রে কোন আনুনাসিকতা শোভা পায় না। আজকের যুগে মানুষ যখন চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে তখন বুঝতে হবে কম্পিউটারের সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করে চলেছে। তবে সবার উপর মানুষ সত্য। কারণ মানুষই কম্পিউটার আবিস্কার করেছে আবার মানুষই তাকে সহায়ক করে বহুদূরে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং কারো সাধ্য নেই এর যাত্রাপথকে রুদ্ধ করে দিতে পারে।

তথ্যবিজ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিস্রাবণ :

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্যবিজ্ঞান কেমন করে পরিস্রাবণ বা শুদ্ধিকরণ করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কথায় কথায় বলতেন 'শুদ্ধজ্ঞান' আর 'শুদ্ধভক্তি' তেমনি আমরা তথ্যবিজ্ঞানীরা জ্ঞানের পরিস্রাবণের কথা বলে থাকি। প্রথম যুগের বেশীরভাগ তথ্যবিজ্ঞানী মূলতঃ গবেষক অথবা বিজ্ঞানকে জীবিকা করে এগিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাদের জীবিকার স্বার্থে তথ্য ম্যানেজমেণ্ট এবং নিয়ন্ত্রন করবার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় তথ্যবিজ্ঞানকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তথ্য বিস্তারে বহু কলা কৌশলের যাঁরা জনক এবং যাঁরা তথ্যের সরবরাহ এবং পরিষেবা পদ্ধতির উন্নতি বিধানে আগ্রহী ছিলেন, তারা অনেক ধরনের কলা কৌশল এবং প্রয়োগ কৌশলের উদ্ভাবন করলেন এবং তা ব্যবহার শুরু করে অনেক সহকর্মীর বিরক্তির কারণ হলেন। আজও আমাদের বৃত্তিতে কোন ব্যক্তি যদি নতুন কিছু করবার চেষ্টা করেন, তবে তিনিও অনেকের মিত্রতালাভে বঞ্চিত হন।

যদি আমরা প্রথম দিকের তথ্য সংগ্রহ ও উদ্ধারের কাজ এবং তার

উন্নয়ণ নিয়ে আলোচনা করি তবে দেখতে পাই কম্পিউটারকে মাধ্যম করে (Computer based information storage and retrieval) তথ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছেন, এ্যারো স্পেস্ রিসার্চ (Aero Space Research), ডিফেন্স এবং মেডিকেল রিসার্চ (Defence and Medical Research) ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অন লাইন সার্ভিস দিয়ে চলেছেন, যেমন Lockhead Dialog. এটি আজকে অন লাইন (On Line) সার্ভিসের ক্ষেত্রে সুপারমার্কেট (Super market) দখল করে রেখেছে। এরা তথ্যব্যবহারকারীদের উপহার দিচ্ছে ২০০ ডাটা বেস এবং ডাটা ব্যাঙ্কস্ (200 Data bases / Data Banks). লক্হিডের এ্যারো স্পেস ডিভিসন (Lockhead Aero-space Division) শুধু যে নিজেদের অঞ্চলে চাহিদা মেটাচ্ছে তাই নয় বরং প্রয়োজনে বিশ্বের জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে। আজ Lockhead DIALOG একটি স্বাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সারা বিশ্বে এর খরিদ্দার রয়েছে এবং এদের সংখ্যাও প্রায় ৫০,০০০ হয়ে গেছে। Lockhead DIALOG-এর অন লাইন সার্ভিসের যদি পর্য্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে এটি একটি মনুষ্য সৃষ্ট জ্ঞানরাজ্যের ক্ষুদ্র পৃথিবী বলে পরিগণিত হয়েছে এবং এটি দ্রুত পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে এটি বেশ আকর্ষণীয় অন লাইন ইলেকট্রনিক্স্ প্রকাশনার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য উদ্ধারের কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য সরবরাহই শুধু নয় তা পরিমার্জন এবং নিয়ন্ত্রণ উভয় কাজই কম্পিউটার করে চলেছে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলি কেমন করে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অন লাইন ডাটা বেস্ (On Line Data Base)-গুলোর ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। আজকে দেখা যাচ্ছে ২০০০ অনলাইন ডাটা বেস (On Line Data Base) জনসাধারণ ইচ্ছা করলে তাদের তথ্যকেন্দ্রে বসেই ব্যবহার করতে সক্ষম। আজকে যদি কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েও বিচার করে দেখি তাহলে দেখতে পাব ৮০ মিলিয়ন রেকর্ড বা তথ্য বাজার মারফৎ বা এই অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিবছর ৮ মিলিয়ন করে রেকর্ড সংযোজিত হচ্ছে। একথা সত্য যে ১৯৫০ সাল থেকে অনলাইন ডাটা বেস (On Line Data Bases) প্রতি

বছর লক্ষ লক্ষ লোককে তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে বহু স্বল্পস্থায়ী এবং বাজে প্রকাশনা বাজারে ভিড় করছে। এটাই আজ তথ্য বিজ্ঞানী এবং তথ্য বিজ্ঞানরূপী বৃত্তির কাছে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আজকের সমস্যা তথ্যের সংগ্রহণের মধ্যে নেই। আজকের সমস্যা কেমন করে তথ্যের পাহাড় থেকে যথাযথ তথ্যকে ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরা যায়। এই উদ্দেশ্যে আই. এস. আই. (Institute for Scientific Information) গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে বেশীর ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট প্রাণপ্রাচুর্য বা রসদ। নির্দ্দেশক-যন্ত্রের মাধ্যমে যে সব তথ্য সরবরাহ করা হয় তাতে দেখা যায় যে এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে।

অধিকাংশ প্রবন্ধ, রিপোর্ট, নিবন্ধ, প্রকরণগ্রন্থ ইত্যাদি যা এসে থাকে শিক্ষায়তন বা গবেষণাগার থেকে আমদানীকৃত ভাবে তাদের সংখ্যা লঘিষ্টতম। এক্ষেত্রে বলা ভালো ব্যক্তিগত উদ্যোগের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে টিম রিসার্চ (Team Research) বা দলবদ্ধ ভাবে গবেষণা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। Eugene Garfield, যিনি বর্তমানে Institute for Scientific Information এর সভাপতি এবং উদ্ধৃতিমূলক নির্দেশকের জনক (Citation Indexing) ও বটে, তার মতে বেশির ভাগ বাণিজ্যিক সংস্থা বা কোম্পানী বাজারে যে সমস্ত বিজ্ঞানের নির্দ্দেশক প্রকাশ করে তার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধ উদ্ধৃত থাকে না এবং যা উদ্ধৃত থাকে তা হিসাব করলে দাঁড়ায় ১.৭% এবং যেগুলো নির্দ্দেশকে উদ্ধৃত করা হয় সেগুলো অনেক আগেই বাণিজ্যিক সংস্থা বা কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া এগুলো ডাটা বেসে (Data Base) এবং গ্রন্থাগারেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীর, গ্রন্থাগারিকের এবং তথ্যবিজ্ঞানীর কাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অনেক রকম উপায় আজকে হয়েছে যা অতীতে কল্পনাও করা যেত না।

বর্তমানে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে যে কোন প্রবন্ধগুলো ঘন ঘন নির্দ্দেশকে উদ্ধৃত হচ্ছে সেটি জানা খুব কঠিন। আমাদের উচিত আমরা যেন সেই লেখকের প্রবন্ধের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

সাফল্য অর্জন করেছেন এবং বিজ্ঞানের জগতে তাদের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং নির্দেশকগুলোতে এগুলির উদ্ধৃতি থাকা দরকার। বাস্তবত এটা অসম্ভব কারণ তথ্যমূলক প্রবন্ধের জগতের যে বিশাল ব্যাপ্তি ঘটেছে সেখান থেকে সঠিক প্রমাণ বাছাই করে তা পরিবেশন করে সমস্যার সমাধান পুরোপুরি সম্ভব নয়, এমনকি এখন পর্যন্ত আমাদের নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাও (**technology**) ক্রমসংখ্যা সমাধানে অপারগ। পূর্বেই বলেছি **Computer** রূপী প্রযুক্তি বিদ্যা মস্তিষ্কের পরিবর্তে স্থাপন করা যায় না। **Computer** মানুষের নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বিশেষ। আজকে জ্ঞান বিস্ফোরণজনিত যে সমস্যা আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করছে তা কোন যন্ত্রদানবের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল চেষ্টা করতে পারি এবং যদি শতকরা ৭০% বা ৮০% সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় তাহলেও একথা বলতে বাধা নেই যে তথ্যবিজ্ঞানীদের কাছে কম্পিউটার নিয়ে এসেছে আশীর্বাদ। আজ চারিদিকে শুধু একটি আওয়াজ—আরো তথ্য চাই। তাই তথ্য বিজ্ঞানের আঙিনায় এই কম্পিউটাররূপী যন্ত্রদানবের নিঃশব্দে আবির্ভাব। পূর্বে যে কথা বলেছিলাম এখনও সেকথা বলব—অন্যান্য সেক্টরে (**Seetor**) যেখানে চাকরীর সুযোগ কমে যাচ্ছে সেখানে তথ্যবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় নতুন নতুন চাকরীর সুযোগ আসছে। কারণ তথ্যই হচ্ছে আজকের তথ্য ভিত্তিক সমাজের বেকন লাইট (**Becon Light**), যা মানুষকে নূতন পথের সন্ধান দেবে।

তথ্য প্রযুক্তিবিস্তার সম্প্রসারণ ঃ

সময়ানুক্রমিকভাবে বলতে গেলে তথ্যের বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে কম্পিউটার বিপ্লবের পূর্বে। আসলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের ফলে জ্ঞানচর্চার নানা দিকে বিস্তার ঘটেছিল। শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এসেছিল আলোড়ন। গবেষণা মূলক নথিপত্র ক্রমাগত বেড়ে উঠল চল্লিশের দশকে। সেদিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ধ্বংসের পরিমাণ যেমন কম ছিল না তেমনি নূতন নূতন বিদ্যার প্রসারও ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। এই সময় রবার্ট ম্যাকনামারা যুদ্ধের প্রয়োজনে পদ্ধতি বিশ্লেষণের তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তা যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ

করে তথ্যবিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে তা সৃজনাত্মক কাজে ব্যবহার শুরু করেন। প্রয়োগবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার সমাজ জীবনে আছড়ে পড়ল। এ সময় বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিকের জন্ম হল এবং শুরু হল নানা মৌলিক বিষয়ের উপর গবেষণা। এসবে ইন্ধন যোগালো কমপিউটার বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেলি কমিউনিকেশন টেকনোলজী (**Telecomunication Technologies**).

এরপর আমরা দেখলাম তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে নূতন বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হল যা মানব সমাজকে নিয়ে গেল, অর্থনৈতিকভাবে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ আনবিক যুগে (**Post Industrial**). নূতন প্রযুক্তি বিদ্যার মাধ্যমে তথ্য সংগঠন এবং তথ্য পরিবেষণ কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করতে আরম্ভ করল এবং তা মানবজীবনে অবধারিত হয়ে দেখা দিল। অখন্ড তথ্য সরবরাহে প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র প্রচলিত কাজকর্ম না করে নূতন ধরনের আধুনিক প্রণালীতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করল।

এই নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে পূর্বের বিভাগ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা বদলে গেল এবং একাধিক নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নূতন সম্ভাবনার উদ্ভব হল এবং অন্যদিকে প্রযুক্তিবিদদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ঘটতে আরম্ভ করল।

একথা ঠিক যে মানব সমাজে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আবার নূতন ধরনের যুক্তিবাদের আদর্শও বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তথ্য আহরণের যে নূতন নূতন প্রক্রিয়া দেখা গেল তা মানব সমাজের চরিত্রকে দিল বদলিয়ে। এই তথ্য পরিচালনায় কমপিউটার প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ মানব সমাজে আশীর্বাদ হয়ে সমৃদ্ধতর স্তরে নিয়ে গেল।

References

1. Crouin, B.—The Information Society (In ASLIB Proceedings, Vol 38, No 4)

2. Mahapatra, P.—The Computer in Library Services 1985.
3. Guha, B.—Documentation and information, 2nd ed. 1983.
4. Ray, Dipak Kumar—Emerging Information Society and its impact on Information Personnel development. (DRTC Silver Jubilee Seminar on Information Personnel Development and Emerging Information Society) 1987.
5. Khanna, J. K.—Library and Society 1987.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব

আধুনিক যুগে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্বীকার করার অর্থ আবার অন্ধকারযুগে ফিরে যাওয়া। তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যছাড়া প্রকৃত তথ্যভিত্তিক সমাজ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব না। তাই সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে তথ্যবিজ্ঞান বা তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব অপরিসীম। সমাজকে উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে চাই নূতন তথ্য, আর এই তথ্য সম্প্রসারণের কাজ করে যাবে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা। তথ্যবিজ্ঞানী জানেন সমাজ বিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে। এজন্যই দেখা যাচ্ছে তথ্য সম্প্রসারণ তার নিজস্ব গতিতেই হয়ে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তিরবিদ্যায় যে নূতন নূতন কলাকৌশল দেখা যাচ্ছে তার মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা জনসাধারণের নিকট দ্রুততার সঙ্গে পেঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তথ্য সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া আজ এমন এক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ের মূল্যায়ণ তথ্যবিজ্ঞানী কমপিউটারের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে করে চলেছেন। বানিজ্যিক ভাষায় বলতে গেলে তথ্যবিদ্যা আজ যে কোন শিল্পজাত দ্রবাদির মান উন্নয়ণ এবং তা সঠিকভাবে যাচাই করবার প্রক্রিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সন্ধান দিয়ে চলেছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডাটা বেস সারা বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্রতর জগতরূপে আমাদের নিকট তুলে ধরেছে। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার যে নেটওয়ার্ক (Network) বা জালবিস্তার হয়েছে তার প্রভাবে গ্রন্থাগারগুলোর অন লাইন সার্ভিস (On Line Service) প্রচণ্ডভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংরাজীতে এই অবস্থাকেই বলা যায় Amplifcation of Information. অর্থাৎ তথ্য সম্প্রসারণের গতি প্রকৃতি সমাজের গতিপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত।

বর্তমানে অনেকসময় শোনা যায় তথ্য প্রক্রিয়া সমগ্র জগতে ব্যাপ্তিলাভ করেছে যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Globalization of Information. অর্থাৎ তথ্য সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের ঘরের কোনে নিয়ে এসেছে। ক্রমবর্ধমান

প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক (Packet Switched network) এবং স্যাটেলাইট (Satellite) যোগাযোগের প্রক্রিয়া, ডাটা আদান প্রদানে খরচ কমে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সীমানাকে আজ এক প্রহসনে পরিণত করেছে। তথ্য পরিবেশনা এখন অন্যতম আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে পরিণত হয়েছে। ম্যাকলুহানের (Mc Luhan) স্বপ্নের আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক গ্রাম আর বেশীদূরে নেই। তথ্যপরিসেবার বাজার এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজার দ্রুততার সঙ্গে সমানতালে বেড়ে চলেছে। একে আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা স্থানীয় বাজার প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের অগ্রগতি এবং প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। জাতীয় সীমানায় ডাটা প্রবাহের ক্ষেত্রে আবার নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে।

এখন দেখা যাক্ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেমন করে নতুন নতুন তথ্য সৃষ্টি হচ্ছে অথবা বলা যায় তথ্য Acceleration হচ্ছে কোন কোন সংস্থার মাধ্যমে। বস্তুতঃ আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য পাচ্ছি। ব্যাংক, স্টকব্রোকার, স্পেকুলেটর (Speculators), লগ্নীকারক প্রভৃতি তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তথ্যবিজ্ঞানীরা তাদের সৃজনধর্মী তথ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করছে। ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক সংস্থায় আজ ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। নীতি নির্ধারণ এবং নীতির সফল প্রয়োগ করতে পূর্বে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হত তা আজ আর হয় না, ইলেকট্রনিক বিদ্যা আমাদের সেই সময় বাঁচিয়ে দিয়ে তথ্য সরবরাহ করছে। একদিন তথ্যবিদ্যায় যা ছিল অকল্পনীয়, তাই আজ হয়েছে বাস্তব ঘটনা।

বর্তমানের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় তথ্যের সঙ্গে জনসাধারণের একীভূত (Massification) হতে হবে। রেললাইন, প্রেস ইত্যাদির কাজের মধ্যেও ইলেকট্রনিকস নিঃশব্দে পদচারণা শুরু করেছে।

তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যেমন আই-বি-এম (I B M) ইত্যাদি ইলেকট্রনিকসের সহায়তায় তথ্য বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছে এসবের প্রভাব তেমনি সামাজিক জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে সরকারী নিয়ন্ত্রণের

বাইরে দুধরনের সমাজও আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে সমাজের যে চেহারা আমরা দেখছি তা হচ্ছে একদিকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজ. যাদের আধুনিক তথ্যব্যবস্থা নিজেদের সমৃদ্ধ করছে এবং অপরদিকে নিরক্ষর মানুষের সমাজ, যেখানে দেখা যাচ্ছে আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ। একথার অর্থ হচ্ছে, আধুনিক তথ্য ব্যবহার করবার মত শিক্ষাদীক্ষা পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্বলশ্রেনীর মানুষের নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তথ্য যদি বৃহত্তর সমাজে না লাগে তবে তথ্যভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে কেমন করে। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে বৃহত্তর সমাজ।

তথ্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক সমাজে প্রচন্ডভাবে দেখা দিচ্ছে। অত্যধিক ইলেকট্রনিক্সে নির্ভরতা অনেক সময় জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়না। তাই বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে হলেও তথ্যব্যুরো (Information Bureau) স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। আর এর মধ্যে তথ্য বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব।

বর্তমানযুগে আর একটি ব্যাপার হচ্ছে অত্যাধিক তথ্যবিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ অনেক সময় হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অনেক সময় তারা বুঝতেই পারে না তথ্য কেমনভাবে পৃথিবীকে নাড়া দিচ্ছে। এর প্রধান কারণ সেইসব মানুষ তথ্য বিষয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে আছে। এর মানে হচ্ছে যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছুতে পারে নি, এসব অঞ্চলের অগ্রগতি সরকারী সহায়তা ছাড়া হতে পারে না। এসব জায়গায় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং জনগণের তথ্যকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাই দেখা যায়, অনুন্নত এবং উন্নতীকামী দেশগুলোতে তথ্যবিস্তার এবং সম্প্রসারণের কাজ তেমন এগোতে পারে নি। এজাতীয় অবস্থাকে অনেকে বলে থাকেন Mystificaton of knowledge.

আমরা অনেকেই জানি প্রযুক্তিবিদ্যা কাজের রূপান্তর ঘটায়—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Transformation. প্রযুক্তিবিদ্যাই পারে নূতন নূতন কর্ম সংস্থান করতে। গ্যাসল্যাম্পের ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই মোমবাতির শিল্পের উপর তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা এভাবেই কাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং পুরানো কাজকর্মের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নূতন কাজকর্মের সৃষ্টি করে চলে। আবার

উন্নত যান্ত্রিক প্রয়োগ কৌশল, অটোমেশন এবং রোবটের ব্যবহার কর্মক্ষেত্রের মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে। একথাও জানা যে অটোমেশন বা রোবট অনেকক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্মসংস্থানের পরিবর্তে কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সরকার অনেকটা বিব্রত বোধ করছে এবং এই সরকারগুলোকে নূতন নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। শিল্পজগতে নূতন উন্নতস্তরের প্রযুক্তির প্রয়োগ বিভিন্নবৃত্তিতে নূতন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে। লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে আজকের প্রযুক্তিবিদ্যা জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিও করে চলেছে।

যত দিন যাচ্ছে তথ্য সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে বা তথ্যের Intensification হচ্ছে। আজ সারা সমাজে বিশেষ করে ব্যবসা এবং সরকারী ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করছে তাদের গতি প্রকৃতি। ইংরাজীতে Technocen বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। এটি খুব বেশি রকম প্রচলিত হয়েছে ৭০ এবং ৮০র দশকে। তথ্য আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

ইদানীং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তথ্য সহজলভ্য হচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে, যাকে বলা যায় Commercialisation হচ্ছে। তথ্য উৎপাদন, সংগ্রহ এবং উদ্ধার করার খরচের পরিমাণ পরিমাপ করবার আধুনিক নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা যাচ্ছে। এখন তথ্য যখন বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসতে শুরু করল তখন কমপিউটারের মাধ্যমে তথ্য বিন্যাস সম্ভব হল এবং তথ্যের নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করবার খরচের মধ্যে একটা সাম্য এসে গেল। তথ্যমূলক বই এর খন্ড বা ভলিউম ব্যবহারের, সময়ের এবং টেলিযোগাযোগের খরচ, রয়েলটি পরিশোধ, মূল যন্ত্রপাতির মূল্য এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির খরচ তথ্য বাজেট প্রস্তুতের জগতে নব দিগন্তের সূচনা করেছে। আরেকটি জিনিষ লক্ষণীয় যে Cost Accountancyর প্রয়োগ এবং নানা ধরনের কলা কৌশল এবং তাদের খরচের বিশ্লেষণ প্রচন্ডভাবে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার উপর প্রভাব ফেলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় অনেক ফার্ম আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রয়োজন তথ্যের এবং তথ্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর অসুবিধা হচ্ছে আধুনিক

প্রযুক্তিবিদ্যা তারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে অপারগ, কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন পাকাপোক্ত ভিতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই। প্রচলিত তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গেই তারা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। তবে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তথ্য উদ্ধারে কমপিউটারের ব্যবহারের প্রতি আজকাল তাদের মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্টি করছে। একটি কথা না বললেই নয়, যে তথ্যভিত্তিক সমাজে যদি তথ্য সঠিকভাবে প্রচলিত না হয়, তবে সে সমাজ আধুনিক বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে না। তার ফলে সমাজ হয়ে পড়বে তথ্যশূন্য। আর সেই ব্যবস্থাকে আমরা তথ্যভিত্তিক সমাজরূপে অভিহিত করতে সক্ষম হব না। তাই পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহে আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

তথ্যভিত্তিক সমাজে তথ্য বিস্তারে সুশিক্ষিত তথ্য কর্মীর ভূমিকা :

যে দিন থেকে আমেরিকার শ্রমশক্তি নিয়ে মার্ক পোরাটের (Marc Porat) পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রকাশনা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে বোঝা গেল সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৫০% ভাগ অর্থনৈতিকভাবে তথ্য বিস্তারে নিয়োজিত। এই সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বহু সংখ্যক তথ্য কর্মী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে এবং বাইরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজকর্ম করে চলেছে।

সংখ্যাতত্ত্ব মেনে নিলে তথ্য কর্মীদের শ্রেণীবিভাগও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। 'তথ্যবিজ্ঞানী' বা 'তথ্যকর্মী' শব্দগুলো আজ সর্বজনের গ্রাহ্য বলে গৃহীত হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে তথ্য কর্মীরা অকস্মাৎ জন মনে রাতারাতি ছাপ রাখেনি, এর জন্য রসদ যুগিয়েছে বিভিন্ন বৃত্তি। আর এই বিভিন্ন বৃত্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তথ্য বিজ্ঞান। তথ্য বিজ্ঞানের বা তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৃত্তির নানা শাখা প্রশাখার স্রোতধারা একত্রিত হয়েছে। যদি আমরা বিভিন্ন বৃত্তিগুলোকে বিভাজন করি, তবে দেখব কি প্রচণ্ড সময় নিয়ে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ নিয়োজিত রয়েছেন তথ্য ভিত্তিক সমাজকে সমৃদ্ধ করবার জন্য। একথা সত্য যে, আকৃতিগতভাবে কতটা পরিমাণ তথ্য সমাজে পরিবেশিত হচ্ছে তা অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। তথ্য বিস্তারের কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে একই ধারায় প্রবাহিত হয় না, কখনো উচ্চগ্রামে আবার কখনো নিম্নগ্রামে

প্রবাহিত হয়। তথ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক আকারে ঘটে থাকে, কিন্তু তার মানে এটা বোঝায় না যে সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি আধুনিক তথ্যভিত্তিক হয়ে পড়েছে। তবে বলা যায় সমাজ তথ্য ভিত্তিক হবার পথে এগিয়ে চলেছে।

একমাত্র সঠিক তথ্য পরিচালন ব্যবস্থাই পারে তথ্য প্রবাহের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নূতন জ্ঞানের জগৎকে মনুষ্য সমাজের নিকট তুলে ধরতে। তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার শিল্প নৈপুণ্য আগামী দিনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মজবুত করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

সংখ্যাতত্ত্বের বর্ম, নির্দেশকযন্ত্র, বক্ররেখার ক্রমিক বৃদ্ধি বা উন্নতি আমেরিকার বাইরে অনেক দেশেই তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি দেখা যাচ্ছে। সুইডেন, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশেও তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সন্তোষজনকভাবে বেড়ে চলেছে। শতকরা আনুপাতিক হারে তথ্য পরিসেবার কাজে নিয়োজিত তথ্য কর্মীর সংখ্যা বেশ দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে যদি ধরে নেওয়া যায় যে এর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি (**Hyperbole**) রয়েছে, তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই, তথ্য আজ সভ্যতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে চূড়ান্ত জয়ের পথে।

References

1. Cromin Blarse—Information Society.
   ASLIB Proceedings. Vol. 38, No. 4.
2. Price, Derek De Solla—Science Since Babylon 1961.
3. Marc, P.—The Information Economy.
   definition and measurement. 1977.

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য ভিত্তিক সমাজে তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদা

অতীতে তথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক আলোচনা হলেও তথ্য ব্যবহারকারী সম্পর্কে তেমন কেউ ভাবেন নি। আমরা জানি তথ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা না বাড়লে তথ্য সৃষ্টির কোন মূল্য থাকে না। তবে বর্তমানে তথ্য বিজ্ঞানীরা তথ্য ব্যবহারকারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করেছেন, এর ফলে তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদা নিয়ে কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে।

তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেছেন Melvin Voigt। তার মতে সব সময় একধরণের তথ্যের প্রয়োজন নিয়ে তথ্য ব্যবহারকারী আসেন না। বিভিন্ন সময়ে একই তথ্যব্যবহারকারীর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা হতে পারে। Voigt তিন ধরণের চাহিদার কথা বলেছেন, যথা—

(ক) আধুনিক চাহিদা (Current approach)

(খ) প্রতিদিনের চাহিদা (Every day approach)

(গ) সমগ্র চাহিদার একত্রীকরণ (Exhaustive approach)

এই তিন রকম চাহিদা ছাড়াও আরো এক রকম চাহিদা এর সাথে যুক্ত হয়েছে। সেটি হচ্ছে (ঘ) তথ্য সংগ্রহের মানকে উন্নত করার চাহিদা (Catching up aproach).

আধুনিক চাহিদা (Current approach) ঃ

প্রতিনিয়তই জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপ্তি ঘটছে। এর ফলে নূতন নূতন বিষয়ের জন্ম হচ্ছে। এই আধুনিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উপায় হচ্ছে সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যাগুলোর উপর নজর রাখা এবং এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা। আমরা জানি তথ্য ব্যবহারকারী কেবল কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের খোঁজখবর না নিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ব্যাপারে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে গবেষকরা অন্তঃবিষয়ের (interdepedent) গবেষণায় আগ্রহী। এই চাহিদাগুলো হচ্ছে আধুনিক চাহিদা।

প্রতিদিনের চাহিদা (Everyday approach) ঃ

প্রতিদিন গবেষক তথ্যব্যবহারকারী বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। কারণ তথ্য ভিত্তিক সমাজে নানাবিধ ঘটনা ঘটছে। জ্ঞানরাজ্যের এই প্রতিদিনকার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য গবেষক তথ্য ব্যবহারকারী গ্রন্হাগারে বা তথ্য কেন্দ্রে এসে হাজির হন। এই তথ্যের চাহিদা মেটানোর কাজে তথ্য বিজ্ঞানীকে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকতে হয় এবং নানাবিধ আকর গ্রন্হের সাহায্য নিতে হয়। এজন্যই এজাতীয় তথ্যের চাহিদা মেটানোকে বলা হয় প্রতিদিনকার চাহিদা।

সমগ্র চাহিদার একত্রীকরণ (Exhaustive approach) ঃ

গবেষক যখন কোন একটি বিষয়ের গবেষণা শুরু করেন তখন তাকে তার পূর্ববর্তী গবেষণার সকল তথ্য জেনে নিতে হয়। এই চাহিদাকে সামগ্রিক চাহিদা বা সমগ্র চাহিদার একত্রীকরণ বলা হয়।

তথ্য সংগ্রহের মানকে উন্নত করবার চাহিদা (Catching up approach) ঃ

কোন কোন গবেষকের নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের অগ্রগতি জানার প্রয়োজন হয়। গবেষক প্রায়ই তার নিজের বিষয়ের তথ্য ছাড়া অন্য বিষয়ের তথ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে জানবার জন্য গ্রন্হাগারে বা তথ্যকেন্দ্রে চলে আসেন। এই ধরণের চাহিদা মেটানোকে বলা হয় তথ্য সংগ্রহের মানকে উন্নত করবার চাহিদা (Catching up approach) বা মানোন্নয়নের চাহিদা।

একটি কথা আমাদের জানা উচিত যে আধুনিক চাহিদার প্রয়োজনে যে সব তথ্য দিয়ে সাহায্য করা হয়, বস্তুতঃ সে ধরণের তথ্য সরবরাহ এক্ষেত্রে অচল।

এখন দেখা যাক আধুনিক চাহিদার ক্ষেত্রে কোন ধরণের পরিসেবা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্রকেই উদ্ভাবন করতে হয় আধুনিক চাহিদার পরিসেবার প্রয়োগ কৌশল। প্রথমতঃ সাময়িক পত্রপত্রিকার সূচীপত্রগুলো সাইক্লোষ্টাইল করে বা ছেপে তথ্য ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে ধরা। এগুলোর মাধ্যমে গবেষকরা জানতে পারেন কোন বিষয়ে গবেষণা কতদূর অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এইধরণের পরিসেবায় Current awareness service এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে Selective

dissemination of information এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তথ্য-ব্যবহারকারীর চাহিদা মত তথ্য তাদের নজরে আনা যায়। তৃতীয়তঃ সেমিনার বা কনফারেন্সের বার্তা বা রিপোর্ট অর্থাৎ আগামীদিনের কনফারেন্স বা সেমিনার সম্পর্কে তথ্য ব্যবহারকারীদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। চতুর্থতঃ সংবাদপত্র থেকে বিশেষ বিশেষ খবর বেছে নিয়ে (News clippings) সেগুলোকে ক্রম অনুযায়ী Vertical file এ রেখে দিতে হবে। এর মাধ্যমে আধুনিক চাহিদা অনেকটা পূরণ করা যেতে পারে। পঞ্চমতঃ মনে রাখতে হবে সদ্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা যেন সঠিক সময়ে তথ্য-ব্যবহারকারীর হাতে এসে যায়। আরও মনে রাখা দরকার, আজকের গবেষণায় সঠিক তথ্য পরিসেবার অভাবে অনেক সময় একই বিষয়ে একাধিক গবেষক কাজ করে ফেলেন (Parallel Research) ; সে ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি গবেষণার কাজ যেখানে শেষ হয়েছে তার পরবর্ত্তী ধাপে গবেষককে এগিয়ে (Research-in-series) যেতে সাহায্য করবার জন্য তথ্য বিজ্ঞানীকে সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এবার দেখা যাক্ প্রাত্যহিক চাহিদার স্বরূপ কেমন ? প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের জন্য তথ্যবিজ্ঞানীকে প্রতিদিন সচেষ্ট থাকতে হয় এবং তথ্যবিজ্ঞানীর সচেতন মানসিকতা প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের চাবিকাঠি। প্রাত্যহিক চাহিদা বলতে বোঝায় প্রতিদিন পাঠকের বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ। এ ধরণের পরিসেবার মধ্যে পড়ে পাঠককে সঠিক পথনির্দ্দেশ (Readers' guidance) রেফারেন্স সার্ভিস, হ্যান্ডবুক, ডাটা বা ফ্যাক্ট সার্ভিস এবং এইসঙ্গে আরেকটা সার্ভিসও এসে পড়ে, সেটা হচ্ছে—অন লাইন সার্ভিস। আমরা সকলেই জানি রেফারেন্স সার্ভিস হচ্ছে তথ্য বিজ্ঞানী কর্ত্তৃক তথ্যব্যবহারকারীকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এখানে তথ্যবিজ্ঞানীকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তথ্য সরবরাহ করতে হয়। অন লাইন ডাটা সার্ভিস হচ্ছে কমপিউটারের মাধ্যমে সরাসরি পাঠককে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা যথাযথভাবে উন্নত পর্য্যায়ে রাখতে হবে। এখানে Dialogue, Medlars, ORBIT (On Line Retrieval of Bibliographical Information and Time shared) এবং EAS (European Space Agency) Euronet সার্ভিসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এবার আসা যাক্ সমগ্র চাহিদার একত্রীকরণের কথায় বা সামগ্রিক চাহিদার কথায়। এধরণের চাহিদার ক্ষেত্রে তথ্য বিজ্ঞানীকে বেশকিছুটা সময় নিয়ে Abstracting Journal বা সংক্ষিপ্তসারের সাময়িক পত্রপত্রিকা ব্যবহার করতে হয়। এধরণের পরিসেবার জন্য নানাধরণের নির্দ্দেশক (Index) এবং ক্রম অনুয়ায়ী সূচী (Cumulative Index) রাখতে হবে।

তথ্যপরিসেবার মান উন্নয়নের চাহিদার ক্ষেত্রে সমীক্ষাধর্মী সাময়িক পত্রপত্রিকার একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত পত্রপত্রিকার বার্ষিক পর্য্যালোচনা থাকে (Annual Review) সেগুলোর ব্যবহার।

তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদার মূল্যায়ণ: তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদায় মূল্যায়ণ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে; অর্থাৎ আমরা সেইসব চাহিদাকে মূল্য দেব যে সব চাহিদা পাঠকের মানসিকতার বিকাশ সাধন করবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে এবং সেইসঙ্গে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক বৃত্তিকে উর্বর করবে। সুতরাং চাহিদা থাকলেই যে সবসময় সব চাহিদাকে মেনে নিতে হবে এমন নয়। তথ্যবিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বের কথাও মনে রাখতে হবে। যেখানে আমরা বলছি তথ্যভিত্তিক সমাজ সেখানে তথ্যবিজ্ঞানী এমন তথ্য দেবেন না যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে সঠিক তথ্য সরববাহের যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে তার সদ্ব্যবহার। তথ্যকেন্দ্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন ধরণের চাহিদা নিয়ে আসবে। আর তাদের রুচি ও যোগ্যতাও বিভিন্ন। তাই সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকের চাহিদাকে মূল্য দিতে হবে।

আর একটি কথা চাহিদার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে এসে পড়ে, সেটি হচ্ছে তথ্যকেন্দ্রে কোন ধরণের তথ্যমূলক দ্রব্যাদির ব্যবহার বেশী হচ্ছে দেখা প্রয়োজন। এজন্য তথ্যব্যবহারকারীর উপদেশ এবং রেফারেন্স বিভাগের নথিপত্র পরীক্ষা করতে হবে। তথ্যকেন্দ্রে নূতন নূতন তথ্যব্যবহারকারী এলে তারা কোন কোন বিষয়ে আগ্রহী তা দেখতে হবে (Subject of Interest). প্রয়োজন হলে যে অঞ্চলে তথ্যকেন্দ্রটি অবস্থিত সেই অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। জনসাধারণের বৃত্তি, তথ্যকেন্দ্রটির অবস্থান গ্রাম বা শহরে কিনা তাও দেখতে হবে। তাই

অঞ্চল অনুসারে গ্রাম বা শহরের মানুষের চাহিদা ভিন্ন হতে বাধ্য। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে এক নূতন ধরনের সমাজ ধীরে ধীরে বিকাশিত হচ্ছে যেখানে সমস্ত কাজের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

References

1. Guha,B.—Documentation, E12 1983.
2. Chakraborty, A. R—Tathya Bigganer Ruparekha. 1986.
3. Voigt, M. J.—Scientists approaches to information, 1961.
4. Wood, D. N.—Use studies, a review of literature from 1966 to 1970 ASLIB Proc. 1971 (23) (1) P. 11—23.

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্যবিজ্ঞান ও ডকুমেণ্টেশনের সম্পর্ক

তথ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে ডকুমেণ্টেশনের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় তারা পরস্পর থেকে বিযুক্ত হয়ে চলতে পারে না। সেইসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার, আধুনিক তথ্যভিত্তিক সমাজ যত এগিয়ে চলেছে ততই সাবেকী গ্রন্থাগারিকতা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কথাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। একথা অনস্বীকার্য যে দীর্ঘকাল ধরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী যে ধরনের সার্ভিস দিতে অভ্যস্থ ছিলেন, পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিগত ভাবে সেই সার্ভিসের মধ্যে নূতন জোয়ার এনেছে তথ্য পরিসেবা এবং ডকুমেণ্টেশন সেবা। বহুদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রয়োজন অনুযায়ী ঘসে মেজে চলেছিল এবং কোন অসুবিধায় পড়ে নি। কিন্তু বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাবিদ্যা বিষয়ে জানার আগ্রহ পাঠকদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল, সেইসঙ্গে নানাধরনের পত্রপত্রিকা, তাদের বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আসতে শুরু করল গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের অঙ্গনে। তাই সনাতন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান দায়ীত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রথম হাজির হলো তথ্যবিজ্ঞান বা ডকুমেণ্টেশনের দরবারে।

তথ্যবিজ্ঞান ডকুমেণ্টেশন পদ্ধতির একটি উন্নত পর্য্যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী শেরা (Shera) বলেছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি অংশ হচ্ছে ডকুমেন্টেশন, কিন্তু এটি কিছুটা উন্নত স্তরের। তবে আমাদের মনে হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ডকুমেন্টেশন ও তথ্যবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়েও তাদের কার্যকারিতার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পদ্ধরির মধ্যে রয়েছে বই নির্বাচন, গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বর্গীকরণ, সূচীকরণ, রেফারেন্স সার্ভিস, গ্রন্থপঞ্জী করণ ইত্যাদি। ডকুমেন্টেশন বা তথ্যবিজ্ঞানে বস্তুতঃ সবধরনের ডকুমেণ্ট বা নথি সংগ্রহ করতে এবং এদের বর্গীকরণ ও নির্দ্দেশক প্রস্তুত করতে হয় এবং সেইসঙ্গে সারাংশ নির্দ্দেশকের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয়। তবে ডকুমেণ্টেশন পরিসেবা মূলত Parallel Research বা একই বিষয়ের গবেষণাকে অতিক্রম করে ক্রমে বিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়; যাকে বলা যায় Research in Series, অর্থাৎ যেখানে গবেষণার একটি বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সেখান থেকে আবার শুরু হবে নতুন গবেষণা।

তথ্যবিজ্ঞানে উপরিউক্ত কার্যক্রম ছাড়া আরো কিছু নূতন পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এগুলো এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা থেকে। এগুলো হচ্ছে, সিস্টেমস এনালিসিস্-পাঠক সম্পর্কে সমীক্ষা (যা আবার এসেছে মনোবিজ্ঞান থেকে), বিবলিওমেট্রিক্স (যেখানে গণিতের প্রভাব) এবং বলতে গেলে আজ নির্দ্দেশক পদ্ধতিতে বেশি ভাষাতত্ত্বের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তথ্যবিজ্ঞানে অর্ধজীবনতত্ত্ব (Half-life Theory), সংক্রামক সূত্র (Epidemic Theory), বিচ্ছুরণ সূত্র (Law of Scattering) প্রভৃতির নিঃশব্দ পদচারণা। তাহলে দেখা যাচ্ছে তথ্যবিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতের প্রভাবকে আর ঠেকানো গেল না। মূলকথা হচ্ছে তথ্যবিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্ফোরণ যা নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছে, তাকে সুসংগঠিত ভাবে সংগ্রহ করে দ্রুততার সঙ্গে পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এবং এরই জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলির সাহায্য তথ্যবিজ্ঞানকে নিতে হবে। বর্তমানযুগে অনুবাদ পরিসেবা (Translation Service) তথ্যবিস্তারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে রেপ্রগ্রাফী, কমপিউটার, টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতি নূতন নূতন বিষয় হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ডকুমেণ্টেশন ও তথ্যবিজ্ঞান মূলতঃ গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত গ্রন্হাগার বিজ্ঞানের ক্রিয়াকর্মের সম্প্রসারণের মধ্যেই আমরা ডকুমেণ্টেশনকে খুঁজে পাই। আবার তথ্যবিজ্ঞান তার কাজকর্মকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং যে ডকুমেন্টেশন শুধুমাত্র মাইক্রো ডকুমেণ্টের কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল তাকে সম্প্রসারিত করেছে তথ্যবিজ্ঞান। এক সময় ছিল, যখন ডকুমেন্টেশন শুধু সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করে সেগুলোর নির্দ্দেশক প্রস্তুতিকরণ ও সার সংক্ষিপ্তকরণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

তথ্যবিজ্ঞান সেই পরিসেবার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র তথ্যব্যবস্থার খোলনলচে পালটে দিল। তথ্যবিজ্ঞানের আগমন হঠাৎ হয়নি। প্রথমে ছিল গ্রন্হাগারিকতা, তারপর এল ডকুমেণ্টেশন এবং সব শেষে আমরা পেলাম তথ্যবিজ্ঞানকে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ

থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত আমরা ডকুমেণ্টেশন শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। ১৯০৫ সালে পল অটলেট (Paul Autlett) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডকুমেন্টশন কথাটি ব্যবহার করেছেন। ১৯২০ সালে Netherland ডকুমেণ্টেশন কথাটি ব্যবহৃত হয়।

(NIDR) এর নামকরণেও Documentation শব্দটির গুরুত্ব বেড়ে গেল। ১৯৩১ সালে আমরা দেখলাম International Institute of Bibliography (I I B) এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হল International Institute of Documentation (I I D). আবার ১৯৩৮ সালে I I Dর নাম উঠে গিয়ে হল Federation International de Documentation (F I D). কিন্তু একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে Documentation শব্দটি সর্বক্ষেত্রে অক্ষত রয়ে গেল। অতঃপর আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেসকোর কাছেও শব্দটি স্বীকৃত হল UNESCO র একটি Commiteeর নামকরণ হল Documentation, Bibliotheque et. Archives (DBA). বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্তরেও Documentation কথাটি স্বীকৃতিলাভ করেছে—যেমন ভারতে INSDOC, পাকিস্থানে PANSDOC এবং ইরাণে IRANDOC (Iranian Documentation Centre) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া Documentation কথা স্বীকৃতি পেল বিভিন্ন প্রকাশনে—যেমন S. C. Bradford এর 'Documentation' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। অ্যাসলিবের (ASLIB) Journal of Documentation, রঙ্গনাথনের Library Science with a slant to Documentation, Annals of Library Science and Documentation ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে Documentation শব্দটির ব্যাপক স্বীকৃতি বোঝা যায়।

ডকুমেন্টেশনের সংজ্ঞা :

বহু গ্রন্থাগারিক ও বিজ্ঞানী বা তথ্য বিজ্ঞানীরা ডকুমেন্টেশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজনের সংজ্ঞা অনুধাবন করলে আমাদের ডকুমেন্টেশনের সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হবে বলে মনে করি। পল অটলেটের দেওয়া সংজ্ঞা সম্ভবত সর্বপ্রথম আমাদের মনকে নূতনভাবে আলোকিত করে। তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে ডকুমেণ্টেশনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সব রকমের নথিপত্র একত্রিত করে বর্গীকৃত অবস্থায় তাকে পাঠক সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়।

ডকুমেন্টেশনের বিশেষজ্ঞ এবং তাত্ত্বিক এস্, সি. ব্রাডফোর্ডের মতে 'ডকুমেন্টেশন এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে নব নব উদ্ভাবিত বিষয়ের নথির সংগ্রহ ও বর্গীকরণ করে স্রষ্টা বা আবিস্কারকের বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনে সেগুলো পেঁছে দেওয়া হয়'। ডঃ রঙ্গনাথন ডকুমেন্টেশনের ব্যাখ্যা করতে পাঁচটি সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। প্রথমতঃ ডকুমেন্টেশনের কাজ বিশেষজ্ঞদের তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং তা ব্যবহারে সাহায্য করা; দ্বিতীয়তঃ বিশেষজ্ঞরা যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য পায় সে ব্যবস্থা করা; তৃতীয়তঃ সামগ্রিকভাবে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা; চতুর্থতঃ যথাশীঘ্র তথ্য পাবার ব্যবস্হা করা এবং সর্বশেষে, হাজার হাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নূতন আবিষ্কৃত সুক্ষ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অবহিত করা। এখন ইংরাজীতে ডঃ রঙ্গনাথনের বক্তব্যকে তুলে ধরা যাক্ "Promotion and Practice of bringing into use of nascent micro thought by specialists (Law 1) and pinpointed (Law 2), exhaustive (Law 3), expeditions (Law 4), service of nascent micro thought to specialists; inspite of continuous increasing cascade (Law 5) of nascent microthought on an ever multiplying number of specialised subjects, communicated through several thousands of periodicals"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয় যে ডকুমেন্টেশনের কাজ মুখ্যতঃ মাইক্রো ডকুমেন্টের ব্যবহারিক প্রয়োগ। সেইসঙ্গে গবেষণার কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই সংজ্ঞাগুলোতে আরো একটি জিনিষ দেখা গেল যে এখানে দু'ধরনের তথ্য মূলক কাজ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম ধারার মধ্যে রয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ, অর্থাৎ গ্রন্হপঞ্জীকরণ, নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ ও বিষয় সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতিকরণ ইত্যাদি। এই অংশকে বলা হয় সক্রিয় ডকুমেন্টেশন (Active Documentation) বা ডকুমেন্টেশনের কর্মকাণ্ড। দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে তথ্য অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ। রেপ্রগ্রাফী বা প্রতিলিপির কাজও ধারার মধ্যে পড়ে। একে নিস্ক্রীয় ডকুমেন্টেশন (Passive Documentation) বা ডকুমেন্টশনের সার্ভিস বলা যেতে পারে। সুতরাং ডকুমেন্টেশনের কাজের মধ্যে পড়ে—(ক) সারসংক্ষেপ (খ) নির্দেশক

প্রস্তুতি করণ (গ) সমীক্ষার কাজ (ঘ) গ্রন্থপঞ্জীকরণ (ঙ) সি এ. এস (CAS) (চ) এস. ডি. আই (SDI) (ছ) কেন্দ্রীয় সূচী (Union catalogue) প্রণয়ণ।

ডকুমেন্টেশনের সেবার মধ্যে পড়েঃ (ক) নথিপত্রের অবস্থান নির্ণয় (Location of Documents) (খ) নথিপত্রের সংগ্রহ (Documents pocurement) (গ) অনুবাদের যে সমস্ত নথি রয়েছে তার অবস্থান নির্ণয়।

এখন বোঝা গেল যে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় প্রথম স্তরকে বলতে হবে ডকুমেন্টেশনের কাজ এবং দ্বিতীয় স্তরকে বলতে হবে ডকুমেন্টেশন সেবা। ডকুমেন্টেশন পরিসেবার সঙ্গে বিশেষ গ্রন্থাগারিকতা বা গ্রন্থাগার পরিসেবা শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে আমেরিকায় 'American Special Library Association' স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সনে ইংলন্ডে 'Association of Special Libraries and Information Bureau (ASLIB)' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তথ্য বিস্তারের নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) আমাদের দেশে বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে সমন্বয় সাধন করেছে তা উল্লেখ না করলে ভারতের তথ্য ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ সময় থেকেই Journal of Special Libraries প্রকাশিত হতে শুরু করে। ASLIB যে Hand book of Special Librarnship and Information Work প্রকাশ করেছিল তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। এসময় থেকে তথ্য বিজ্ঞানের যে সমস্ত পরিপূরক শব্দ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল, সেগুলো হল 'Information Retrieval', আর Information Retrieval কথাটির প্রবক্তা হচ্ছেন Calvin Moors. পঞ্চাশের দশকে রেপ্রগ্রাফী, পাঞ্চকার্ড ইত্যাদির প্রচলন বিশ্বের অনেক জায়গায় দেখা গেল। এসব যান্ত্রিক ব্যবস্থা তথ্যের ব্যাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার তথ্য বিজ্ঞান (Information Science) কথাটি প্রচলন হয়েছিল প্রথম আমেরিকাতে। ষাটের দশকে দেখা গেল ১৯৬৮ সালে American Documentation Institute (ADI) পরিবর্ত্তিত হয়ে হল American Society for Information Science (ASIS). সাময়িক পত্রপত্রিকা American Documentation এর নূতন নামকরণ করা হল। বর্তমানে এর নাম American Society for Information Science এবং Annual

Review of Information Science and Tcchnology (ARIST). সোভিয়েত রাশিয়ার তথ্য বিজ্ঞানী মিখাইল গিলজারভেস্কি এবং চেনি 'Informatics' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে সমস্ত কোর্স চালু আছে সে সব কোর্সের সঙ্গেও তথ্যবিজ্ঞান (Information) কথাটি এখন সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বশেষে একথা আমরা বলতে পারি বিশ্বে সর্বত্র তথ্যব্যবস্থার মধ্যে একটা Globalization লক্ষ্য করছি। ফলে বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির মূলে রয়েছে তথ্যভিত্তিক সমাজ। সেই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সৃষ্টি হচ্ছে, নূতন নূতন তথ্যের আকর। ইংরাজীতে একেই বলা হয় Acceleration of Information. একদিন গ্রন্থাগারিকতা নাম দিয়ে যে বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই বিজ্ঞান পরবর্তীকালে Documentation বলে পরিচিত হল আজ তাকেই তথ্যবিজ্ঞান বলছি। আসলে তথ্যবিজ্ঞান ডকুমেন্টেশনেরই এক উন্নত ধাপ। মানুষের চলার পথে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যা অনেকটা পথ দেখানোর কাজ করে চলে। কমপিউটারের ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে তথ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। এখন আবার শিল্পক্ষেত্রে রোবটের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। তথ্যকে সুসংহতরূপে পরিবেশনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিশ্লেষণ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ (Systems Analysis) প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং নিয়োজিত হয়েছিল ধ্বংসাত্মক কাজে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাকেই সৃজনাত্মক কাজে ব্যবহার শুরু করেছেন। তাই তথ্যপ্রযুক্তিবিদরাও একে তথ্যপরিসেবার কাজে লাগাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

References

1. Chakraborty A. R.—Tattya Bigganer Ruprekha 1986.
2. Guha. B.—Documentation and Information ; 2nd. ed. 1983.
3. Ranganathan S. R.—Doccumentation and its facets. 1963.
4. Dombowska, Maria—Documentation.

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়বস্তুর জগৎ ও তথ্যবিজ্ঞান

গ্রন্থাগারিকের তথা তথ্যবিজ্ঞানীর সার্থকতা নির্ভর করে তার বিষয়বস্তুর জগৎ সম্বন্ধে কতটা পরিচিতি রয়েছে তার উপর। বিষয়-বস্তুর বিস্তৃতি যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সেই বিস্তৃতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত না থাকি তবে আমাদের পক্ষে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্র নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমরা জানি যে বিষয়বস্তুর গতিপ্রকৃতি বহুমুখী। বিষয়বস্তুর প্রকাশও বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার তারতম্য অনুসারে তাদের এক-একটা রূপ দেখা দেয়। তাদেরই ডঃ রঙ্গনাথন Facets বা রূপের কথা বলেছেন। এখন বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হতে হচ্ছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদের অবাধ প্রগতিশীল হবার প্রবণতা। অহরহ আমরা দেখছি, একটি বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন ধরণের রূপ নিয়ে আবির্ভাব ঘটছে, এতেই বিভিন্ন ধারণার বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই বিষয়ের জগতে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন যে ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যখন আমরা কোন বর্গীকরণের পরিকল্পনা করা বা সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করি। **D. C.** তে স্থান ও কাল (**Place & Time**) প্রথমে ছিল না। এগুলো পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরো লক্ষ্য করলাম যে, ক্রমে ক্রমে সংশ্লেষণ (**Synthesis**)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে পরিচিত করার ব্যবস্থা **D. C.** তে নেওয়া হয়েছে। যারা **U.D.C.** ব্যবহার করেন তারা জানেন কেমন করে **U.D.C.**-তে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়কে বর্গীকৃত করা হয়েছে। **Colon classification**-এর সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিষয়ের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের চোখে বিষয়বস্তুর প্রস্তুতিকরণ :

একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন একটি বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি মাত্র মূল বিষয় থাকে এবং অনেক সময় একটি মূল বিষয়ের মধ্যে একাধিক ধারণা

অসংগঠিতভাবে রয়ে যায়। যেহেতু বিষয়বস্তুর সঙ্গে এগুলো মিশে থাকে, সেজন্য এগুলোকে বলা হয় মিশ্রবস্তু।

অসংগঠিত ধারণা সংযোগে বিষয়বস্তুর সৃষ্টি :

যদি কোন ধারণা নিজে থেকে বিষয়বস্তু না হয়ে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে অন্য কোন ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয় তখন তাকে যৌগিক বিষয়বস্তু বলা হয়। ধরা যাক্, শিশু একটি isolate বা অসংগঠিত ধারণা। কিন্তু যদি বলা যায়, শিশুশিক্ষা বা শিশুমনস্তত্ব, তখন এগুলো বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হবে।

বিষয়বস্তু মূলতঃ তিন প্রকার যেমন, মূল বিষয়বস্তু, মিশ্র বিষয়বস্তু ও যৌগিক বিষয়বস্তু।

মূল বিষয়বস্তু (Basic subject) : যে সময় বিষয়বস্তুতে অংশ হিসাবে অন্য কোন ধারণা বা isolate idea থাকে না তাকে বলা হয় মূল বিষয়বস্তু, যথা—ধর্ম (**Religion**), পদার্থবিদ্যা (**Physics**), মনোবিদ্যা (**Psychology**), রসায়ণবিদ্যা (**chemistry**) ইত্যাদি।

মিশ্র বিষয়বস্তু (Compound Subject) : যখন মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাধিক ধারণা বা isolate idea যুক্ত হয়, তখন তাকে মিশ্র বিষয়বস্তু বলা হয়। যেমন বাংলা সাহিত্য, খৃষ্টধর্ম ইতাদি।

যৌগিক বিষয়বস্তু (Complex subject) : দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুকে যুক্ত করে যদি কোন সম্পর্ক বোঝাতে হয় তখন তাকে Complex subject বলা হয়।

এখন দেখা যাক্ কেমন করে নতুন নতুন বিষয়ের জন্ম হয়।

(ক) ১। **বিষয়বস্তুর স্বাধীন সমাবেশ** (Loose Assemblage).

এই স্বাধীন সমাবেশকে বন্ধনহীন সমাবেশও অনেকে বলে থাকেন। দুই বা ততোধিক বিষয়ের সমাবেশকে যখন একটি বিষয়রূপে প্রকাশ করি তখন তাকে বিষয়বস্তুর স্বাধীন সমাবেশ বলি। আর এই স্বাধীন সমাবেশ তিনভাবে হতে পারে। এসকল সম্পর্ককে বলা হয় বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পর বন্ধনী। ইংরাজীতে একে বলে Inter Subject phase relation. এগুলো আবার ছয় প্রকারের হয়ে থাকে।

(i) সাধারণ (General)—অঙ্কের সঙ্গে জীববিদ্যার সম্পর্ক।

(ii) পক্ষপাত (Bias)—জীববিদ্যার উপর পদার্থবিদ্যার পক্ষপাত।

(iii) তুলনা (Comparison)—পদার্থবিদ্যার সঙ্গে রসায়ণশাস্ত্রের তুলনা।

(iv) পার্থক্য (Difference)—কৃষিবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যার পার্থক্য।

(v) প্রভাব (Influence)—সাহিত্যের উপর দর্শনের প্রভাব।

(vi) সাধনী (Tool)—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগ।

(ক) ২। Loose Assemblage আলোচনা করতে গেলে একই Schedule (শ্রেণীর) এর মধ্যে দুই বা ততোধিক ধারণার (isolate) সমাবেশ হয় এবং তাদের সম্পর্কে ধারণার জন্ম দেয়। ইংরাজীতে বলে Intra Schudule Phase Relation. এই রূপগুলো আবার ছয় রকমের হতে পারে—

(i) সাধারণ—হিন্দুধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের সম্পর্ক।

(ii) পক্ষপাত—অর্থনীতির সঙ্গে গণিতের পক্ষপাতিত্ব।

(iii) তুলনা—অর্থনীতির সঙ্গে গণিতের তুলনা।

(iv) পার্থকা—হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য।

(v) প্রভাব—বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব

(vi) সাধনী—C.C.কে বর্গীকরণের বা Tool হিসাবে ব্যবহার।

(ক) ৩। যখন একটি শ্রেণীর মধ্যে দুই বা ততোধিক ধারণার এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক এমনভাবে প্রতিফলিত হবে তা সমপদস্থ সম্পর্কের ধারণা হবে তখন একে ইংরাজীতে Intra Array Facet বলা যাবে।

এ ধরণের সম্পর্কও ছয় প্রকার—

(i) সাধারণ—বড়লোক ও মাঝারি বড়লোকের সম্পর্ক।

(ii) পক্ষপাত—U.D.C. ও D.C. পদ্ধতির পক্ষপাত।

(iii) তুলনা—বড় চাকরীর সঙ্গে ছোট চাকরীর তুলনা।

(iv) পার্থক্য—D.C. ও C.C.-র পার্থক্য।

(v) প্রভাব—গরীবদের উপর ধনীদের প্রভাব।

(vi) টুল—গরুর সাহায্যে চাষবাস ইত্যাদি।

(খ) **লেমিনেসন** (Lamination)—বাংলায় যাকে বলে স্তরমিলন বা স্তরলেপন। বিষয়ের বিভিন্নরূপের অন্তর্গত নানারকম ধারণা যখন মূল

বিষয়ের উপর লেপন করে নতুন বিষয়ের জন্ম দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় Lamination। যেমন—

ইতিহাস ইংল্যান্ড গঠনতন্ত্র
মূল বিষয়

হাসপাতাল ঔষধ রুগী
মূল বিষয়

মোটকথা লেমিনেশনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের লেপনক্রিয়া দ্বারা মূল বিষয় প্রাণবন্ত হয়।

আবার যেমন—অর্থনীতি—জনগণের আর্থিক অবস্থা—উৎপাদন।

(গ) **বিভক্তিকরণ** (Fission)—এই প্রক্রিয়ায় ধারণা (isolate) ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা হয়। এই বিভক্তিকরণ নানারকম হতে পারে।

(i) মূল বিষয়কে অথবা **Isolate** বা ধারণাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়, যেমন—Physics — Heat — Sound

অথবা দর্শন — তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি।

(ii) **Isolate** বা ধারণাকে এভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(iii) সমাজবিজ্ঞান (Array Division) যেমন—ইউরোপ মহাদেশ — ইংল্যান্ড — জার্মানী — ফ্রান্স ইত্যাদি।

(iv) একটি মুখ্য ধারণার সঙ্গে যুক্ত একটি বিশেষ ধারণার।

যেমন—মোটরগাড়ী — মারুতি (**Speciator**)।

বাইসাইকেল — হিন্দ সাইকেল। এখানে 'হিন্দ' ব্রাণ্ড হচ্ছে **Speciator.**

(ঘ) ব্যবচ্ছেদ (**Disection**)—যখন কোন একটি **Basic Subject** অথবা **Isolate** বিভাগের পর সমপর্যায়ে ফেলে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় তখনই তাকে বলা হয় **Disection.**

(ঙ) **Denudation** বা নির্মোচন—কোন **Basic Subject**-কে বা ধারণাকে যখন কেবলমাত্র একটি ভাগে ভাগ করা যায় তখনই তাকে **Denudation** বলে।

(চ) একীকরণ (**Fusion**)—অনেক সময় দুই বা ততোধিক বিষয় মিশে গিয়ে একীভূত হয়ে একটি নতুন বিষয়ের জন্ম দেয়। তখন তাকে একীকরণ বা **Fusion** বলে। যেমন, **Biology**-র সঙ্গে

Chemistry মিশে হ'ল **Biochemistry, Biology**-র সঙ্গে **Physics** মিশে হ'ল **Biophysics.**

(ছ) **Distillation**—বাংলায় **Distillation**-কে পাতন বলে। এটি তথ্যবিজ্ঞানে যে সমস্ত প্রক্রিয়া রয়েছে তাদের মধ্যে এক অসাধারণ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রণের ভেতর থেকে নতুন বিষয় বেরিয়ে এলে আমরা তাকে বলি বিষয়টি **Distilled** হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ের নাম যাই হোক এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় যৌগিকভাবে অবস্থান করে। যেমন **Management**-এর সঙ্গে **Science** মিশে হল **Management Science, Research**-এর সঙ্গে **Methodology** মিশে হ'ল **Research Methodology, Statistics**-এর সঙ্গে **Analysis distilled** হয়ে হ'ল **Statistical Analysis.**

(জ) **Agglomeration**—যাকে বাংলায় বলা যায় পিণ্ডীভবন। এই প্রণালীতে বিভিন্ন বিষয়কে একত্রিত করে একটি বিশাল বিষয়ের উৎপত্তি হয়, অথচ একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায় না। যেমন—

Natural Science
Physical Science
The Humanities
Social Science

(ঝ) **Cluster**—আমরা সচরাচর (**Cluster**) বা গুচ্ছের সম্পর্কে বলে থাকি। কোন একটি পদ্ধতিতে একটি বিষয়ের কতকগুলো বিশেষ অনুধাবন একত্রিত করে একটি অনুধাবনের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

(ক) **Area Study**
- (i) **Indology**
- (ii) **Orientation**

(খ) **General Person Study**
Gandhiana

(গ) **Entity or Phenomena Study**
- (i) **Soil Science**
- (ii) **Space Science**

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বিষয়বস্তুর গঠন-প্রণালী বিষয়বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সঙ্গে Loose

Assemblage, Lamination, Fission, Denudation, Fusion, Distillation, Agglomeration এবং Cluster কিভাবে নতুন নতুন বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে চলেছে।

আমরা জানি তথ্যবিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিষয় নিয়ে। তাই জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের বিস্তৃতি বেড়ে চলেছে এবং তা অনন্তকাল চলবে। তাই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে শুধু বিষয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেই চলবে না—এতে গ্রন্থাগারিকের কাজ সঠিকভাবে সমাধান হবে না। সেই সঙ্গে বিষয়ের রূপান্তর এবং বিকাশ আমাদের জেনে নিতে হবে এবং তবেই সঠিক পাঠকের কাছে সঠিক সময়ে তথ্য তুলে দিতে আমরা সক্ষম হব।

References

1. Kumar, Krishan—Theory of classification
New Edition, 1988.
2. Ranganathan, S. R.—Prolegomena to Library
Classification 1967.
3. Banerjee, P. C.—Classification 1984.

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আমাদের একথা বুঝতে হবে যে মানুষের সৃষ্টির আদি থেকেই বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী চলার শক্তি প্রভৃতি গুণের প্রকাশ দেখা যায়। যতই আমাদের চিন্তাশক্তি ক্রমবর্ধমানরূপে বিকশিত হতে আরম্ভ হ'ল ততই জ্ঞান দ্রুত আমাদের উন্নত পর্য্যায়ে যুগের পর যুগ ধরে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। তখন এর পাশাপাশি নানা ধরনের তথ্য মানুষের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। মানব ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতে সচেষ্ট হতে থাকে। সংগৃহীত তথ্য রাখবারও বিভিন্ন প্রক্রিয়া দেখা গেল। ছবি, মাটির ট্যাবলেট, প্যাপিরাস রোল প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ তথ্য ধরে রেখে তা একদিন আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

তথ্যের কোন মূল্য থাকে না যদি না সেগুলোকে সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া যায়। আর এটাই হচ্ছে গ্রন্থাগারের মূল কাজ। একটি গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংগঠিত করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে মিটিয়ে দেওয়া। গ্রন্থাগারে যে কোন ধরণের তথ্য পাবার আশা নিয়ে পাঠক বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে আসতে পারে।

আজকে জ্ঞান বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়ে চলেছে। সুতরাং বিভিন্ন ডকুমেন্টের মাধ্যমে জ্ঞানের সংরক্ষণ গ্রন্থাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জ্ঞানের অগ্রগতি যেমন অব্যাহত, তেমনি তাকে যোগ্যতার সঙ্গে উদ্ধার করে পাঠক সাধারণের কাছে উন্মোচিত করার মধ্যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা নির্ভর করছে। এ বিষয়ে আজকে আধুনিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে, যাতে দ্রুত তথ্য ব্যবহারকারীকে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারা যায়।

তথ্য সম্বলিত নথি আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কারীগরী জ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাকে সঠিক মূল্যায়ণ করে পাঠকের হাতে তুলে দিলে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব।

বৃত্তিমূলক সাময়িক পত্রিকাগুলোর মধ্যে আজ একটি কথা বার বার উচ্চারিত হয়, তা হচ্ছে, 'জ্ঞান বিস্ফোরণ'। এই তথ্য প্রবাহ বা বিস্ফোরণকে গ্রন্থাগারিক যেভাবে সংগঠিত করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। যদিও এগুলো অনেক সময় সঠিক ভাবে পরিচালিত হয় না।

তথ্য বিস্ফোরণ ঃ তথ্যের ব্যাপ্তি ঘটানোতে গ্রন্থাগার আজ যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের কর্ত্তব্য তথ্য বিস্ফোরণ ব্যাপারটা কি তা জানা। ক্রমান্বয়ে বিকশিত তথ্য সাময়িক পত্রপত্রিকা বা গবেষণার ফলাফল সমাযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাঠকের নিকট পেঁছে দেওয়া গ্রন্থাগারের মূল কর্ত্তব্য। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বহুরকম সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। C.P. Bourney দেখিয়েছেন যে কেমন করে ১৫,০০০ হাজার মূল্যবান পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়ে গবেষণার কাজে সহায়ক হচ্ছে। C.M. Gotts chalk এবং Desmond ৩৫,০০০ হাজার সাময়িক পত্রপত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন। Dr. S. R. Ranganathan ৫০,০০০ হাজার পত্রপত্রিকার কথা বলেছেন তার মধ্যে বেশির ভাগ বিদ্বদ্‌জন-গ্রাহ্য প্রবন্ধ রয়েছে।

সমস্যাটা এখানে শেষ হয়নি। কারণ বিজ্ঞান কারীগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আগামী ৭ থেকে ৯ বছরের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ কারিগরী ও বিজ্ঞান বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধও প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। এগুলো সঠিকভাবে সংগঠিত করার সময় এসেছে। মাইক্রোডকুমেন্ট নিয়ে বিচার বিবেচনা চলছে।

বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশক থেকে এবং তা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠে সত্তরের দশকে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়-গ্রন্থাগার কেমন করে এই জ্ঞান বিস্ফোরণকে ধরে রাখতে পারে এবং সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করে তথ্য বা জ্ঞান পাঠকের নিকট পেঁছে দেয়। তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে যেভাবে লক্ষ লক্ষ উক্ত বিষয়ের প্রবন্ধাদি বৃষ্টির মত আছড়ে পড়ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র অসতর্ক হলে গবেষকের প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে আনবিক শক্তি ও দূরদর্শন বা টেলিভিশন প্রভৃতির বিষয়ে নানাবিধ উপাদান ও তথ্য

নথির মারফৎ গ্রন্থাগারে আসছে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে বা তথ্য বিজ্ঞানীকে তথ্য পাঠকের নিকট দ্রুত পেঁছে দেবার জন্য কমপিউটারের সাহায্য নিতে হচ্ছে। আজ যারা তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে কমপিউটারকে অচ্ছুৎ করে রেখেছেন তারা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবেন। একথা ঠিক গ্রন্থাগারিক বা তথ্য বিজ্ঞানী কমপিউটার বিশারদ হবেন তা ভাবা সঠিক হবে না, তবে কমপিউটার বিজ্ঞানে পারদর্শী কর্মীকে সাহায্য করবার জন্য গ্রন্থাগারিক বা তথ্য বিজ্ঞানীকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আর সেই সঙ্গে কমপিউটারের মাধ্যমে তথ্য উদ্ধার করবার প্রক্রিয়া তথ্য বিজ্ঞানীকে জেনে নিতে হবে।

যেহেতু প্রতি মিনিটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিন্তাধারার জন্ম হচ্ছে এবং তা নথিভুক্ত হচ্ছে, সেইহেতু এগুলো সংগঠিত করবার জন্য তথ্যবিজ্ঞানীকে নানা ভাবের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমরা যদি বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করি তবে দেখবো তা কোন একটি বিশেষ নিয়মের মধ্যে হয়নি। নানা পথ ধরে তাকে বিকশিত হতে হয়েছে। সেই সঙ্গে তথ্য উদ্ধারের প্রক্রিয়াও নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তাছাড়া জ্ঞানের গতিপ্রকৃতিও এমন পরিবর্তিত হয়েছে, যা এক বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। এ প্রবণতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বেশী রকম পরিলক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। তবে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারে মাইক্রোডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও তা পাঠকের নিকট পরিবেশনের সমস্যার উল্লেখ না করলে বোধ হয় সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অসুবিধা হবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে **Bradford** এর **"Law of Scattering"** সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা আবশ্যক। এতে বলা হচ্ছে যে, বিশেষ বিষয়ের প্রবন্ধ যেমন বিশেষ বিষয়ের পত্র পত্রিকায় (**Periodicals**) প্রকাশিত হয়, তেমন তা আবার অপ্রত্যাশিতভাবে বিষয় বহির্ভূত পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এই অগণিত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি সঠিকভাবে খুঁজে বের করে সংগ্রহ করার পদ্ধতির মধ্যেই Bradford এর "Law of Scattering" প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

তথ্য সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করে যখন আমাদের অন্তঃ বিষয়ের মধ্যে থেকে তথ্য উদ্ধার করতে হয়। আর অন্তঃ বিষয়ের যখন জন্ম হয়েছে তখন থেকেই বিষয়ের গতি প্রকৃতি জটীল থেকে জটিলতর হতে শুরু করেছে। আজকের নানা বিষয়ের সংমিশ্রণে জন্ম নিয়েছে নূতন নূতন বিষয় যা পূর্বে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। **Biology** ও **Physics** মিশে হয়েছে **Biophysics**, **Biology** ও **Chemistry** মিলে হয়েছে **Biochemistry** ইত্যাদি। যাই হোক এই সমস্যার সঙ্গে আর একটি সমস্যা হচ্ছে তথ্য গ্রন্থাগারে আসছে বিভিন্ন ধরণের নথির (**document**) মধ্যে দিয়ে। এগুলোর মধ্যে বই, পত্রপত্রিকা (**Periodicals**) প্রিপ্রিন্ট (**Preprint**), নোট (**Notes**), নিবন্ধ, ব্যক্তিগতপত্র, কম্পিউটার প্রিন্টআউট (**Computer Print Outs**), ম্যাগনেটিক টেপ (**Magnetic tapes**) ডাটা (**Data**), টেবল্‌স্‌ (**Tables**), ডায়াগ্রাম্‌স্‌ (**Diagrams**), চার্ট (**charts**), সংক্ষিপ্তসার (**Abstracts**), নির্দ্দেশক (**Indexes**), কথাবার্তা (**Dialogues**) বক্তৃতা, সম্মেলনের নথিপত্র (**Conference Papers**), কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট (**Technical Reports**), সমালোচনা (**Reviews**), থিসিস (**Thesis**), মাইক্রোফরম (**Microforms**) ইত্যাদি।

বস্তুত আশির দশকে আমরা যা অবলোকন করছি তা হচ্ছে তথ্য বিস্ফোরণের মহাপ্লাবন। আমাদের জীবনে বেশির ভাগ জুড়ে আছে তথ্যের বন্যা।

দেখা যাচ্ছে যে ভাবে তথ্যমূলক নথিপত্র প্রতিদিন গ্রন্থাগারে জমা হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি ঘটছে এবং সেই সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। যাই হোক গবেষকরা যথা সময়ে আশা করেন যে তারা গ্রন্থাগার থেকে সঠিক তথ্য পাবেন। তথ্য বিজ্ঞানী তাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দেখছি বিষয়ের ভাগ্য প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিস্থিতিতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য উদ্ধার এবং তথ্য পরিবেশন এবং গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজের ব্যাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করছে। আজকের দিনে যৌথ গবেষণার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং গবেষকদের চাই নূতন নূতন তথ্য। আর সেজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী তথা তথ্য বিজ্ঞানীকে তথ্যের আকর সাজিয়ে বসে থাকতে হবে এবং তথ্যের আকর যাতে

যথাযথভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গবেষকদের নিকট পেঁছে দেওয়া যায় তার প্রয়োগ কৌশলও তাকে জানতে হবে।

তথ্য বিস্ফোরণের বিশেষণগুলো বিচার বিবেচনা করলে তথ্যবিজ্ঞানীর মধ্যে কতকগুলো ভাবনা সহজেই অনুভূত হয়। সে অনুভব করে তথ্য বর্গীকরণের উপযোগী একটি বর্গীকরণ অনুসূচী বা শিডিউল এবং একটি বিশেষ পদ্ধতি। একশ বছর আগে যে ভাবে বিষয়ের বর্গীকরণ হয়েছে তা আজকে অচল হতে চলেছে। সুতরাং আজকের জগতে বিষয়ের বিস্তৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাই নূতন ধরণের নমনীয় বর্গীকরণ শিডিউল যার সাহায্যে অতি সহজেই তথ্য আহরণ করা যাবে এবং তা পাঠকের নিকট পেঁছে দেওয়া যাবে। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে এখনও আজকের উপযোগী বর্গীকরণ স্কীম বা শিডিউল আমরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হইনি। তথ্য সংগঠন পদ্ধতি আরো উন্নত করতে হবে। অন্যথা দ্রুতগতিতে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

তথ্য বিস্ফোরণের ফলে আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যম গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে UNISIST, ICSU, IFLA, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক তথ্যপরিসেবা ও পদ্ধতির জন্য INIS, AGRIS, DEVSI, INSPEC, MEDLARS, এবং SPINES ইত্যাদি। INSDOC, SENDOC, DESIDOC, NISSAT, SSDC (India), INFOLINE, EURONET (U.K), LOCKHEED ; SDC, OCLC (USA) এবং VINITI (USSR) প্রভৃতি জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই নির্দেশক এবং সারের মাধ্যমে যেমন MARC, INDEX MEDICUS প্রভৃতি আজ তথ্য সরবরাহকে অনেক সহজ করেছে। প্রত্যেক গবেষণাগারের মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারটি তথ্য ব্যুরো (Bureau) হিসাবে কাজ করে চলেছে।

এইভাবে গ্রন্থাগার তথ্যের ব্যাপ্তি ঘটানোর কাজ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ করছে। গবেষক আজ গ্রন্থাগার থেকে মূল্যবান তথ্য পেয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করছে।

সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। তাই

দেখা যায় সমাজে বিভিন্নধরণের গ্রন্থাগার। আধুনিক সমাজে নানা ধরণের পাঠককে দেখা যায়। তাদের মধ্যে ছাত্র, পন্ডিত, সাধারণ লোক, গবেষক, ব্যবসায়ী, কৃষক, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি রয়েছে। এদের চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার। যেমন ঃ—

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগার।

(খ) বিদ্যায়তন গ্রন্থাগার।

(গ) বিশেষ গ্রন্থাগার।

(ঘ) জাতীয় গ্রন্থাগার।

এইসব গ্রন্থাগারগুলো বিশেষ বিশেষ কারণে ও প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। যদিও এদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের কিন্তু কতকগুলো অভিন্ন কাজ এদের করতে হয়, যেমন ঃ—

(১) গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক দিক।

(২) তথ্যের আকর সংগ্রহন।

(৩) দ্রুতগতিতে এবং সঠিকভাবে তথ্য পরিবেশন।

(৪) তথ্য ব্যবহারকারীদের স্বাভাবিকভাবে সেবা ইত্যাদি।

তবে গ্রন্থাগারগুলোর কাজকর্ম নির্ভর করে তাদের আয়তন, উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রকৃতির উপর। আসলে গ্রন্থাগারটির কাজ এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে যে বিষয়টি নিহিত রয়েছে সেটি হল এই যে গ্রন্থাগারটি কতটা সার্থকভাবে তথ্যের বিস্তার ঘটিয়ে প্রকৃতপক্ষে তথ্য কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

References

1. Khanna, J. K.—Libraay and Society, 1987.

2. Sengupta. B & Chatterjee. M. in association with Chatterjee, S.—Documentation and Information Retrieval. 1977.

3. Olle, J. G.—A Guide to sources of information in Libraries. 1984.

4. Guha. B.—Documentation and Information Services, Techniques and Systems, 1983.

সপ্তম অধ্যায়

তথ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা

তথ্যের উৎস নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবু তথ্য বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তথ্যের মাধ্যমগুলোর বাহ্যিক চেহারাগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না দিলে তথ্যবিজ্ঞান আলোচনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এটা অনেকটা বৈষ্ণবপদাবলীর গৌরচন্দ্রিকার আলোচনার মত। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পর্কে কিছু না বললে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা প্রাণবন্ত হয় না, ঠিক সেই রকম তথ্যের বাহ্যিক রূপ এবং উৎস আলোচনা না করলে তথ্য বিজ্ঞান আলোচনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। একথা ঠিক যে সময়ের যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তথ্যের বাহ্যিক রূপও ঠিক সেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। একটা সময় সংবাদপত্রই একমাত্র তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম ছিল। কিন্তু আজ আর সেকথা বলা চলে না। সংবাদপত্র ছাড়া ফিল্ম, রেকর্ড, স্লাইড ও ক্যাসেটের ন্যায় অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম রয়েছে এবং সেইসঙ্গে যন্ত্রচালিত পাঞ্চকার্ড, ম্যাগনেটিক টেপস এবং ডিস্ক ইত্যাদি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যদিও উন্নত দেশে বেশির ভাগ গ্রন্থাগার কম্পিউটারকে মাধ্যম করেছে। তবুও বলতে হবে যে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও সীমিত পর্যায়ে গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত।

রঙ্গনাথন বলেছেন তথ্যের উৎস চার প্রকার ঃ

(ক) প্রচলিত নথি (**Conventional Document**).

(খ) নব প্রচলিত নথি (**Neo conventional document**).

(গ) অপ্রচলিত নথি (**Non conventional document**).

(ঘ) অনুনথি (**Meta document**).

প্রচলিত নথি ঃ বই, সাময়িকপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি।

নব প্রচলিত নথি ঃ ষ্টান্ডার্ড (**Standard**), স্পেসিফিকেশন (**Specification**), পেটেন্ট (**Patent**) ও ডাটা (**Data**) ইত্যাদি।

অপ্রচলিত নথি ঃ এই নূতন ধরনের তথ্যের উদ্ভব হয়েছে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজনে। এগুলি হচ্ছে, মাইক্রোকার্ড (**Microcard**),

মাইক্রোফিল্ম (Microfilm), মাইক্রোফিস (Microfiche) ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন Audio visul documents ব্যবহার আজ আর নূতন নয়, যদিও এসকল নথি অপ্রথাগত শ্রেণীর।

অনুনথি ঃ এমন কিছু তথ্য রয়েছে যাতে মানুষের তৈরী যন্ত্রের ভূমিকা থাকলেও মানবমনের ভূমিকা বিশেষ নেই—যেমন র‍্যাডারে পাওয়া তথ্য। এধরণের নথিকে অনুনথি বলা হয়। রঙ্গনাথন এসকল নথির বহিঃপ্রকৃতির উপর জোর দিয়েছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মাধ্যমের যে পরিবর্তন হয়েছে সেই বিবর্তনই এখানে প্রতিফলিত।

সি. ডবলিউ হানসন নথি সমূহকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। তথ্যের গুণাগুণ বিচার করেই এই বিভাজন। প্রাথমিক (primary) উৎস হচ্ছে বই, সাময়িক প্রতিবেদন, পেটেন্ট, মানক গবেষণাপত্র। মাধ্যমিক উৎসে উদাহরণ হিসাবে ধরা হয়েছে সারকরণ সূচীকরণ পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জি, সমীক্ষা ইত্যাদি।

আবার ডেনিস গ্রোগান তথ্যের উৎসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রান্তিক।

প্রাথমিক ঃ সাময়িক পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন, সম্মেলনে উপস্থিত লেখা, পেটেন্ট, গবেষণাপত্র, বাণিজ্যিকপত্র মানক ইত্যাদি।

মাধ্যমিক ঃ সারকরণ, সূচীকরণ পত্রিকা, সমীক্ষা, অভিধান, বিশ্বকোষ, বই ইত্যাদি।

প্রান্তিক ঃ বর্ষপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, নির্দ্দেশিকা কেন্দ্রীয়সূচী, চলমান গবেষণার তালিকা ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে হ্যানসন যে দ্বিতীয় ভাগটি করেছিলেন গ্রোগানের তৃতীয় ভাগটি অনেকটা অনুরূপ (প্রান্তিক) তবে একথা ঠিক গ্রোগানের মত-ই বেশী প্রচলিত।

একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত গবেষণার প্রসারে প্রাথমিক উৎসের গুরুত্ব অনেক বেশী। যেমন পেটেন্ট, মানক, রিপোট, থিসিস ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস। গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গবেষণার ফলাফল সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গুণগত দিকে আলোচনা করলে সাময়িক পত্রকে নানাভাবে ভাগ করা যায়—যেমন গবেষণা পত্রিকা, বাণিজ্যিক পত্রিকা, কারিগরী পত্রিকা, সাধারণ সাময়িক পত্র। ফলে সাময়িক পত্রের বিভিন্ন তারতম্য ঘটে অবশ্য যদি আমরা

গুণগত বিচারে বসি। বস্তুতঃ গবেষকের সাময়িক পত্রিকা বর্তমান চাহিদা মেটায়। এছাড়া গবেষণার প্রতিবেদন (Resarch report), মানক (Standard), থিসিস (Thesis), মাধ্যমিক উৎস (Recording source), সারকরণ ও সূচীকরণ পত্রিকা (Abstracting and Indexing periodicals), সমীক্ষা (Review) আকর গ্রন্থ (Reference book) ও বিষয় গ্রন্থ।

বিষয় গ্রন্থের মধ্যে (১) ট্রিটিজ (Treatise), (২) মনোগ্রাফ (Monograph), (৩) পাঠ্যবই (Text book) ইত্যাদি নথিপত্র (Document) গবেষণা থেকে সাধারণ পঠন পাঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

প্রান্তিক উৎস (Tertiary source) অনুধাবন করলে দেখা যায় এগুলো গবেষকদের যেমন তথ্য দিয়ে সাহায্য করে ঠিক সাধারণ পাঠকেরও সেরকম উপকার সাধন করে। যেমন বর্ষপঞ্জী (Year book), নির্দেশিকা (Directory) তথ্য নির্দেশিকা (Guide to literature), চলমান গবেষণার তালিকা (List of research in progress), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography), রচনা বহির্ভূত উৎস (Non documentary source) ইত্যাদির নথিগুলো নানাভাবে পাঠক, গবেষক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া গবেষকরা বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থিত থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বহু তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। একথা যেন ভুলে না যাই যে Institution বা সংগঠনও তথ্যের এক উল্লেখযোগ্য উৎস। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে নূতন তথ্যের জন্ম হয় এবং সব সময় তা প্রকাশিত হয় না।

একমাত্র প্রতিষ্ঠান গুলোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই এদের নব আবিস্কৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

References

1. Grogan, D.—Science & technology—an introduction to the literature, 2nd ed. 1977.
2. Guha, B.—Documentation and information, 2nd ed. 1983
3. Hanson, C. W.—Introduction to Science Information work. 1971.
4. Ranganathan, S. R. ed.—Documentation and its facets. 1963.
5. Chakraborti, A. R.—Tathya Bigganer Ruprekha.
6. Parker, C. C. & Turly R. V.—Information Sources in Science and Technology 1975.

অষ্টম অধ্যায়

বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরিবেশন ও সংগঠনের প্রক্রিয়া

সি. এ. এস (C. A. S. = Current Awareness Service)

বর্তমান যুগে আধুনিক তথ্যের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে এবং বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের উদ্ভবের সঙ্গে সেই বিষয় সম্পর্কে জানবার আগ্রহও প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার, গবেষককে নিজের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে এগোতে হবে। একথা আমাদের সকলের জানা যে, আধুনিক সাময়িক পত্র পত্রিকা পড়তে পারলে গবেষকের পক্ষে তথ্য পাওয়া সহজ হয়। একথাও আমরা জানি, কোন কোন বিষয়ের এত বেশী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে কমপিউটারের প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

যে কোন বিষয়ের মাধ্যমিক পত্রিকায় (**Indexing and Abstracting periodicals**) অনেক বিষয়ের বেশির ভাগ সাময়িক পত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মাধ্যমিক পত্রিকার নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন। আবার একটা সমস্যা হচ্ছে সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ এবং মাধ্যমিক পত্রিকার প্রকাশের মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান থেকে যায়। মাধ্যমিক (Secondary) পত্রিকার বিষয় কিছুটা পুরানো হয়ে যায়।

সুতরাং সাময়িক পত্র ও মাধ্যমিক পত্রিকার মধ্যে যে সময়ের একটা ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি হয়, সেই ব্যবস্থাকে দূরীভূত করবার জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাকে সি. এ. এস বা **Current Awareness Service** বলে। **C. A. S.** সম্পর্কে রঙ্গনাথন (**Ranganathan**) বলেছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশিত সকল নথির তালিকা যা কোন একজন নির্দ্দিষ্ট পাঠকের প্রয়োজনে সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর তৈরী করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে সেই সেবা পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি করে। সেই সেবা পাঠককে তার বিষয়ের সম্পর্কিত বিষয়ে নবীনতম তথ্য দ্রুত সরবরাহ করে।

সি. এ. এস. এর বৈশিষ্ঠ্য : (ক) এই সেবা নির্দ্দিষ্ট তথ্য খোঁজার জন্য নয়, বরং নব আবিস্কৃত তথ্যের উপর চোখ বুলিয়ে কাজ করতে হয়। একথাও ঠিক, চোখ বোলাতে গিয়েও বহু বিষয়ে অগ্রগতি জানা সম্ভব।

(খ) এই পরিসেবা পাঠস্পৃহা বাড়িয়ে দেয়।

(গ) এই সেবার একটা বড় দিক হচ্ছে কেবল আধুনিক চাহিদা মেটায়, ফলে সি. এ. এস. এর পুরানো সূচীর কপির ব্যবহার হয় না। পুরানো সূচীর প্রয়োজন নেই।

(ঘ) কেবলমাত্র আধুনিক চাহিদা মেটায় বলে সি. এ. এস. কে বলা হয় 'It is a perishable commodity.'

সি. এ. এস. স্তর :

আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয়—এই তিন স্তরে এই সেবা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক সেবার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে **I. S. I. Philadelphia** কর্তৃক প্রকাশিত **Current Content** যা বিশ্বের তথ্যের বাজারকে সমৃদ্ধ করেছে।

জাতীয় স্তরে VINITI রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান এবং এরা প্রভাব বিস্তার করেছে Express Information Service এর উপর।

স্থানীয় স্তরে ইচ্ছা করলে বিভিন্ন স্তরের তথ্য ব্যবস্থায় এ জাতীয় সেবা দেওয়া সম্ভব। আসলে প্রয়োজন হচ্ছে Current Awareness Service সেবার মানসিকতা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থার মধ্যে যদি সেই বন্ধনের কাজ করা সম্ভব হয়, তবেই জ্ঞানের জগতের সম্প্রসারণ সম্ভব। আজ আমরা তথ্যের বাজার সম্পর্কে যে কথা বলছি, তা নির্ভর করে কতটা Current Awareness Service আমরা পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজ যখন উন্নতদেশে Intensive গবেষণা চলছে, তখন আমরা দেখছি আমাদের দেশে সেভাবে Current Awareness Service এর ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। তবে একথা অস্বীকার করবার কারণ নেই যে, ভারতেও আজ বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যার জন্ম হচ্ছে। অতএব অচিরেই এখানে Current Awareness Service চালু হবে।

সি. এ. এস. এর পদ্ধতি :

(ক) সূচীপত্র পদ্ধতি

(খ) ব্যাপক বিষয় ভিত্তিক

(গ) বর্গীকৃত পদ্ধতি

(ঘ) প্রকল্প ভিত্তিক

(ঙ) মিশ্রিত পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধের প্রকাশ ও পরে মাধ্যমিক পত্রিকায় তার অন্তর্ভুক্তির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান হয় তা দূর করবার জন্যই এই সার্ভিসের (**service**) সৃষ্টি। অতএব যত কম সময় নিয়ে এই সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যাবে ততই এর গুরুত্ব বাড়বে।

এস. ডি. আই ঃ আজ জ্ঞানরাজ্যে যে বিস্ফোরণ হচ্ছে তাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে কোন গবেষকের পক্ষেই নিজ বিষয়ের প্রয়োজনে তথ্য পাওয়া প্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য উদ্ভব হয়েছে এস. ডি. আই সার্ভিসের (**Selective Dissemination of information**)। আমেরিকার তথ্য বিজ্ঞানী **P. A. Luhn** এর নাম আমরা সকলেই জানি। এও জানি ইনি **K W I C** নির্দ্দেশকের প্রবর্ত্তক। **S D I** সম্পর্কে তিনি বলেছেন এটি তথ্য কেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে এমন একটি সেবা, যার সাহায্যে ছড়িয়ে থাকা নানা বিষয়ের ডকুমেণ্টকে একত্র করে এবং বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে হবে। রঙ্গনাথন বলেছেন, এই পদ্ধতি সুনির্দ্দিষ্ট ও সামগ্রিকভাবে যথাশীঘ্র তথ্য যোগায়।

S D I পদ্ধতি অনেকগুলো ধাপের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

(১) পাঠকপ্রোফাইল বা ব্যবহারকারীর চাহিদার বিবরণ, **Demand** জানার পর **Term** ও **Code** এ লিপিবদ্ধ করতে হয়। **Tuesarous** থেকে শব্দ চয়ন করা ভালো।

(২) **Document Profile** বা নথির বিবরণ।

(৩) **Matching /** মিলন—এর কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে সুসংবদ্ধ করা যায়।

(৪) **Notification** / জ্ঞাপন—**Abstract, Keyword Citation** ইত্যাদির প্রয়োগ।

(৫) **Feedback** প্রতিক্রিয়া—এর মাধ্যমে তথ্যকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা।

(৬) **Profile modification**—প্রোফাইল সংশোধন। যান্ত্রিক ও কায়িক **S D I** (Computerised **S D I**)

References

1. **Guhu, B**.—Documentation and Information, 2nd. ed. 1982.
2. **Ranganathan, S. R.** (ed)—Documentation and its facets. 1963.
3. **Joshi, M. G. & Narayan, G. J.**—Current awareness service—What it is.

নবম অধ্যায়

তথ্য পরিসেবায় নির্দ্দেশক প্রক্রিয়া

তথ্য পরিসেবায় নির্দ্দেশকের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্দ্দেশক প্রস্তুত করা হয় এবং তাদের বৈচিত্র্যও কম নয়।

নির্দ্দেশক দুই প্রকার—(ক) প্রচলিত নির্দ্দেশক এবং (খ) অপ্রচলিত নির্দ্দেশক।

প্রচলিত নির্দ্দেশক :

(ক) **বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণ :**

শব্দ, পদ বা বিষয় নির্দ্দেশক পদের বইপত্র এবং পত্রপত্রিকার প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়গুলিকে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়। সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হলে একই বিষয় নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) **বর্গীকৃত নির্দ্দেশক :** বর্ণানুক্রমিক নির্দ্দেশকের অসুবিধা হচ্ছে একাধিক বিষয়ের পাঠ্যবস্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বর্গীকৃত নির্দ্দেশকের সে সম্ভাবনা নেই। বর্গীকৃত সংলেখগুলি বর্গীকরণের Notation বা চিহ্ন অনুযায়ী সাজানো হয়। তবে যেহেতু বর্গীকরণের চিহ্নগুলো সাধারণ পাঠকরা বুঝতে পারে না সেজন্য সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি বর্ণানুক্রমিক নির্দ্দেশক প্রস্তুত রাখতে হয়, যা দেখে পাঠকরা কোন বিষয়ের চিহ্ন দিয়ে খুঁজলে বর্গীকৃত নির্দ্দেশক থেকে তার প্রার্থীত বিষয় খুঁজে পেয়ে যাবে।

(গ) **চেন নির্দ্দেশক :** ডঃ রঙ্গনাথন এই চেন নির্দ্দেশকের আবিষ্কারক এবং নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণে নতুন যুগের সন্ধান দিয়েছেন। এই নির্দ্দেশক প্রায় নিজে থেকেই নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে উচ্চস্তর থেকে ধাপে ধাপে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভাজন করে এগিয়ে যায়। আর এই বিভাজনকে ভিত্তি করেই বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দ্দেশক তৈরী হয়।

যদিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম বর্গীকৃত ক্যাটালগ প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছিল, তথাপি কালক্রমে বর্গীকৃত নির্দ্দেশক প্রস্তুত করতে এটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল।

এবার দেখা যাক্, এই প্রক্রিয়ায় বিভাজন কাজটি কেমন করে হয়। কোন বর্গীকরণ সংখ্যাকে ভিত্তি করে এর বিভাজন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে।

যেমন—Harvesting of Rice.

J —কৃষি

J 3 —খাদ্য

J 38—বীজ

J 381—ধান

J 381 : 7—চাষ

নির্দ্দেশক প্রস্তুত করার সময় নীচের শব্দগুলো থেকে শুরু করতে হয় যা এই বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশ। এইভাবে ধাপে ধাপে ব্যাপক বিষয়ের দিকে যেতে হয়। ১৯৬৪ সালে রঙ্গনাথনের বিষয় কাঠামোতে Direct rendering বা সরাসরি ব্যবহার অনুমোদন করেন। এভাবে চাষ : ধান : কৃষিকার্য, না হয়ে কৃষিকার্য : ধান : চাষ ইত্যাদি দিয়ে চেন নির্দ্দেশক তৈরী করতে হয়। এই পদ্ধতিতে একটি প্রধান ত্রুটী হচ্ছে বিষয় বিভাজনের স্তরে ফাঁক থাকে, ইংরাজীতে যাকে বলে Dissappearing chain. এই সমস্যা দূর করবার জন্য বিষয় কাঠামোর অংশ গুলোকে ঘুরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন ডঃ গণেশ ভট্টাচার্য ও নীল মেঘন।

সুবিধা : (ক) বিষয় নির্দ্দেশকের জগতে চেন নির্দ্দেশক প্রথম একটি সুসংহত প্রয়াস।

(খ) বর্গীকরণের সময় যে বিশ্লেষণের বিষয় (Subject structure) পাওয়া যায়, তাই চেন নির্দ্দেশক প্রস্তুত করণে কাজে লাগে।

(গ) বর্গীকরণে একটি বিষয়ের ধারণাগুলোকে যেভাবে সাজানো হয়, তাই প্রস্তুত করণে কাজে লাগে।

(ঘ) এই পদ্ধতি যেকোন বর্গীকরণের সাহায্যে করা চলে।

(ঙ) বিষয় কাঠামোর বাদ যাওয়া অংশগুলোকে ঘুরিয়ে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

(চ) বস্তুত এই প্রক্রিয়াটি প্রায় যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা হয়।

অসুবিধা : (ক) বিভাজনের ধাপে ফাঁক থাকার জন্য এই পদ্ধতিতে একটি বড় সমস্যা দেখা যায়।

(খ) বর্গীকরণের সাথে এই পদ্ধতির যোগ থাকায় বর্গীকরণের দোষ ত্রুটি চেন নির্দ্দেশকের উপর পড়ে।

(গ) বর্গীকরণে বিভাজনের ধাপে ত্রুটী থাকলে লুপ্ত সম্পর্ক (Missing Link) এবং ভুল সম্পর্ক এবং অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক (unsought Link) সৃষ্টি হয়।

(ঘ) প্রচলিত বর্গীকরণের বিষয়গুলো যে প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাই সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব ত্রুটী বিচ্যুতি থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গতানুগতিক নির্দ্দেশক পদ্ধতিগুলোর চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক উন্নত স্তরের। এককথায় বলা যায় এই চেন পদ্ধতি আমাদের নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণে নূতন আশার আলো দেখিয়েছে।

পপ্‌সি ঃ পপ্‌সি ইংরাজীতে 'Postulate based Permuted Subject Indexing' বা **POPSI** বলে পরিচিত। এই নির্দ্দেশক পদ্ধতি রঙ্গনাথনের কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চেন নির্দ্দেশকের যে দুর্বলতা দেখা যায়, সেগুলো পপ্‌সি পদ্ধতিতে দূর করবার চেষ্টা হয়েছে। বস্তুতঃ ভারতে যে সময় পপ্‌সি পদ্ধতির জন্ম হয়েছে, সেই সময়ে বৃটেনে প্রেসিজ্ (PRECIS) পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী গনেশ ভট্টাচার্য এটিকে রূপ দিয়েছেন। পপ্‌সির মাধ্যমে নির্দ্দশককে প্রয়োজনমত যে কোন নির্দ্দিষ্ট রূপে রূপান্তর করা সম্ভব। ইংরাজীতে একেই বলা যায় Specfic Version এ রূপান্তরিত হওয়া। এইভাবে আমরা দেখছি POPSI র মাধ্যমে Subject Formulation করে নির্দ্দেশক প্রস্তুত করা যায়। পাঠকের প্রশ্নের কাঠামো বা Query Formulation তৈরী পপসি পদ্ধতিতে সম্ভব।

পপ্‌সির মূল নীতি ঃ পপসির মূলনীতি দাঁড়িয়ে আছে DEAP-এর উপর। এর অর্থ হচ্ছে D—বিষয় (Discipline), E—সত্ত্বা (Entity), A—কার্য সম্পাদন (Action), P—গুণাগুণ (Property)। D-এর মধ্য দিয়ে কোন বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়, যেমন, অর্থনীতিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। E-এর মাধ্যমে কোন স্থানকালকে নির্দ্দেশ করা যায় অর্থাৎ পাহাড়, গাছপালা, বা বিশেষ সময়কে বোঝানো হয়। A-এর মধ্যে ফুটে ওঠে কোন কর্ম বা ক্রিয়া। যেমন চিকিৎসা, বা মেশিন চালানো প্রভৃতি প্রক্রিয়া। P-এর মাধ্যমে কোন কিছুর গুণ বা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝানো হয়। এছাড়াও Modifier-এর মাধ্যমে গুণবাচক ক্রিয়ার কল্পনা করা হয়েছে। যেমন ইংরাজী নাটক বা বাংলা নাটক। এখানে ইংরাজী নাটকের ইংরাজী বা বাংলা নাটকের বাংলা হচ্ছে Modifier.

পপ্‌সির ব্যাকরণগত দিক ঃ পপ্‌সির ব্যাকরণগত দিককে ইংরাজিতে বলা হয় Syntax এবং শব্দাবলীকে বলা হয় Symantics. একথা পূর্বেই বলা হয়েছে পপ্‌সি রঙ্গনাথনের বর্গীকরণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এটি ব্যাকরণ ও বর্গীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই পদ্ধতিতে শব্দের সমন্বয়ক্রম বা Citation order ঠিক করবার জন্য POPSI-র তালিকা (POPSI TABLE) ব্যবহার করা হয়। পপ্‌সি নির্দেশকে প্রক্রিয়ায় কমা (,) ফুলস্টপ (.) হাইফেন (-) প্রভৃতি চিহ্নও ব্যবহার করা হয়।

শব্দাবলী সঠিকভাবে সজ্জিত করণের এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য Classaurus যা নাকি Classification ও Tuesaurus—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে তাকে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পপসির একটি অংশে সাতটি শ্রেণীতে শব্দগুলি সাজানো আছে এবং অন্য অংশটি হচ্ছে বর্ণানুক্রমিক নির্দেশক।

নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি—

এই পদ্ধতিতে আটটি ধাপে নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ করা হয়।

১। বিশ্লেষণ (Analysis)।

২। আকারস্থিরকরণ (Formalisation)।

৩। নীতি নির্ধারণ (Standardisation)।

৪। সঠিক শব্দ প্রয়োগ (Modulation)।

৫। বর্গীকরণে সাহায্যকারী শব্দ চয়ন বা EOC (Preparation of Entries for Organising Classification) প্রস্তুতিকরণ।

৬। স্থিরকরণ (Terms of approach)

৭। EAC প্রস্তুতকরণ (Preparation of Entries for Associative Classification)।

৮। আক্ষরিকক্রম নির্ধারণ (Alphabetisation)

এখন দেখা যাক; Chemical treatment of Cancer of heart এর ক্ষেত্রে কেমন করে উপরিউক্ত ৮টি ধাপের মাধ্যমে নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ সম্ভব।

১। বিশ্লেষণ ঃ— Medicine (D)
Chemical Treatment (A)
Cancer (P)
Heart (E)

২। আকার স্থিরকরণ ঃ— Medicine (D) ; Heart (E) ; Cancer (P of E) ; Chemical treatment (A of P).

৩। নীতি নির্ধারণ—এখানে Chemical treatment এর স্থলে Chemotherapy বসানো হল। সুতরাং Medicine (D) Heart (E) Cancer (P of E) Chemothera py (A of P).

৪। সঠিক শব্দ প্রয়োগ—এখানে বিষয় কাঠামোর মধ্যভাগে বা দুইপ্রান্ত সীমায় প্রয়োজন শব্দযোগ (interpolation and extrapolation)।

যেমন ঃ—Medicine (D) Man, Blood circulatory system, Heart (E) Disease, Cancer (Pol E) Treatment. of Chemotherapy (Chemical Tteament) [A on P].

৫। EOC প্রস্তুতিকরণ—এখানে Main entry করা হয় এমনভাবে যা বাকী entry তৈরী করতে সাহায্য করে। এখানে entry রূপ দাঁড়ায় ঃ Medicine 6, Man, Blood circulatory system, Heart 6.2. Disease, Cancer 6.2.1 Treatment, Chemo-Therapy.

৬। T. A. স্থির করা—এ পর্যায়ে Approach term স্থির করা হয়, যেমন Man, Animal, Efficiency, প্রভৃতি সাধারণ শব্দ শীর্ষক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া এখানে সমার্থক শব্দও নিয়ন্ত্রণ করা হর এবং এক সংলেখের সঙ্গে অন্য সংলেখ সম্পর্ক স্থির করা হয়।

৭। EAC স্থির করা—এই স্তরে সকল শীর্ষক শব্দ চয়নের পক্ষে Entry গুলো সাজানো হয়।

যেমন ঃ Blood circulatary system.
Medicine, Cancer 6.2.1. Treatment Chemotherapy.

৮। আক্ষরিক ক্রমনির্ধারণ—এই পর্য্যায়ে সকল শীর্ষককে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়। যেমন ঃ Chemical treatment, see chemotherapy, Blood circulatory system.

Medicine 6 Man, Blood circulatory system. Heart 6.2 Disease 6.2.1 Treatment, chemotherapy Cancer.

Medicine 6 Man. Blood circulatory system. Heart 6.2 Disease. Cancer 6.2.1. Treatment Chemotherapy, Chemical Treatment, see Chemotherapy.

Chemotherapy—

Medicine 6 Man. Blood circulatory system. Heart 6.2. Disease, Cancer 6.2.1. Treatment. Chemotherapy Disease.

Medicine 6 Man Blood ciuculatory system. Heart 6.2. Disease 6.2.1. Treatment. Chemotherapy Heart.

Medicine 6 Man. Blood circulatory system. Heart. 6.2. Disease Cancer 6.2.1. Treatment. Chemotherapy.

প্রেসিজ

প্রেসিজ কথাটি ইংরাজীতে PRECIS বা Preserved Context Indexing System বলে পরিচিত। সত্তরের দশকে alphabetical নির্দ্দেশকের জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল, সেখানে প্রেসিজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এই নির্দ্দেশক প্রক্রিয়ায় Role operator এর মত একটি নূতন ধারণার জন্ম হয়। এদিকে B N B তে আন্তর্জাতিক Marc প্রকল্পে যখন এই ব্যবস্থা জড়িয়ে পড়ল, তখন American Library of Congress এর বই এর তালিকায় Computer টেপ বিনিময়ের প্রশ্ন দেখা দেয়। BNB এই টেপকে কাজে লাগিয়ে তাদের Bibliography প্রকাশের চেষ্টা করছে এবং PRECIS ব্যবস্থা BNBতে সুফল ফলালো।

PRECIS শব্দের পরস্পর সম্পর্ক তিনভাবে বোঝায়। অষ্টিন সাহেব PRECIS নির্দ্দেশকের সূচনা করেছেন। প্রথমতঃ Semantic relationship হচ্ছে সেই সম্পর্কযক্তবিষয় যার সাহায্যে কোন একটি বিষয়ে Genus Species এর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চিন্তার কথা এসে পড়ে। যেমন, বাঘ (Tiger) এর Genus Animal.

দ্বিতীয়তঃ Syntactic Relationship হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়া যা কোন বিষয়ের অংশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

Early / Treatment / of Cancer / in man Symantic in Precis কে সার্থক রূপায়ন করা সম্ভব see and see also রেফারেন্স এর মাধ্যমে।

Feature of Role operation

Main line operating Environment of observed System, Observed System (Core operators)	O Location 1. Key system 2 Action / Effect 3 Agent of transitive action
A. Data relating to observer selected Instance	4 View point as-form 5 Sample-population / study Religion 6 Target / Form
Presentation of Data	
Interposed operators Dependent Elements Concept interlinks	p Part / property q Member of Quasi Genetic group r Aggregate s Role definer t Author attributed association
Coordinate Concepts	g Co-ordinate concepts

B Differencing operators Prefixed by	h Non-lead direct difference
	i Lead direct difference
	J Salient difference
	K Non lead indirect difference
	M Lead indirect difference
	N Non lead Parenthetical difference
	O Lead Parenthetical difference
	d Date as difference
Connectives	V Downward reading component
	W Upward reading component
Theme interlink	X First element in coordinate Theme
	Y Subsequent element in coordinate Theme
	Z Element of common Theme

তৃতীয়তঃ Common frame of referenceকে পাওয়া যায় গ্রন্থাগারগুলোতে Computer এর সফল প্রয়োগের মধ্যে। যেমন, Training/ of skilled personnel / in textile / industries / of India.

নির্দেশক প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়া—এই প্রক্রিয়ায় String terms এবং Role operators প্রয়োগ করে নির্দ্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। Terms গুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি Role operator এর সাহায্যে স্থির করা হয়। String প্রস্তুত করার পর Precis এর কাঠামো প্রস্তুত করা সম্ভব এবং সেই সঙ্গে one to one relation থাকবে।

ধরা যাক, Training of skilled personnel in / Textile industries / of India.

এবার Role operating এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি Termএর Role নির্দ্দেশ করলে তাদের ক্রম পাওয়া যায়।

(O) India
(I) Textile industry
(P) Skilled Personnel
(2) Training

এখন Role operator দ্বারা যে string তৈরী হল, তা দিয়ে এবার এর সংলেখ তৈরী করতে হবে।

সংলেখ কাঠামোর তিনটি অংশ—(১) শীর্ষক, (২) বিশেষক (qualifier) এবং (৩) প্রদর্শন (Display) এই অংশগুলো নিয়ে Entryর সাধারণ আকৃতি নিচে দেওয়া হল।

Lead **Qualifier**

Display

পূর্বে যে String তৈরী হয়েছে তাকে সাজানো যেতে পারে। India, Textile industry, Skilled Personnel, Training

(ক) India | Qualifier

Textile Industries Skilled Personnel Training

(খ) Textile industries | India

Skilled Personnel Training

(গ) Skilled Personnel | Textile industries, India

Training

(ঘ) Training

Skilled Personnel Textile Industries India

Display

উপরিউক্ত উদাহরণে one to one relation বা সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। এর মানে হচ্ছে একটি শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে তার পটভূমিও গড়ে ওঠে।

অপ্রচলিত নির্দেশক :

(ক) **সমন্বয় সূচী** (Co-ordinating Indexing)

আজকাল গবেষণা inter-disciplinary হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় একে অপরের উপর নির্ভর করে চলে। তাই বর্ত্তমানে গবেষণা একাধিক ধারণা বা বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। নির্দ্দেশককরণকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ এবং সেই শব্দগুলোর সমন্বয় করা দরকার। সুতরাং নির্দ্দেশককরণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে নির্দ্দেশককরণের পদের (Term) সমন্বয় করা হয় না, আসলে ধারণার সমন্বয় করা হয়।

সমন্বয় দুইস্থানে হতে পারে। নির্দ্দেশককরণের সময় (input stage , অথবা তথ্য খোঁজার সময় (output stage)। প্রথম প্রক্রিয়ায় যে নির্দ্দেশক প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলা হয় প্রাক সমন্বয় সূচী (Precoordinate Index) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উত্তর সময় সূচী (Post Coordinate Index)। প্রাক্ সমন্বয় নির্দ্দেশকের সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য খুঁজে তাতে মিলন ঘটানো। পাঠকের query formulation এর সঙ্গে Subject formulation মিল হলেই তথ্যের খবর পাওয়া যাবে। নির্দ্দেশক প্রস্তুত করণে বিভিন্ন বিষয়ের বা ধারণার সমন্বয় কিভাবে করা হয়েছে পাঠককে তা জানাতে হবে। তা নাহলে তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অনেকগুলো বিষয়ের নির্দ্দেশককরণ পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী নির্দ্দেশককরণকে একটি মাত্র সমন্বয় বেছে নিতে হয়। এভাবে বাছাই করা সমন্বয় পদ্ধতি সব সময় পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রাক সমন্বয় নির্দ্দেশকের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

প্রাক্ সমন্বয় নির্দ্দেশকের সমস্যা বিশেষ করে এই সূচীর অনমনীয় সমন্বয়ের ক্রমের সমস্যার দরুণ এক নূতন ধরণের নির্দ্দেশকের জন্ম হল। এই নূতন ধরণের নির্দ্দেশকের সমন্বয়ের ক্রম নির্ধারণে অনেক নূতন সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। জটীল বিষয়ের ধারণাগুলোকে এই নির্দ্দেশকে পৃথকভাবে রাখা হয়েছে। তথ্য অনুসন্ধানের সময়

পাঠক প্রয়োজনীয় ধারণাগুলোকে সমন্বয় করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। এভাবে অনুসন্ধানের সময় (output stage) সমন্বয় করা হয় সেজন্যই এই পদ্ধতিকে উত্তর সমন্বয় নির্দেশক (Post coordinate Index) বলা হয়। এই সমন্বয় নির্দেশককে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—পদ সূচী (Term record) ও সংখ্যা সূচী (Item record)। প্রথমটির মাথায় একটি ধারণা (concept) লিখে রাখা হয় এবং যে সকল ডকুমেন্টে ঐ ধারণা আলোচিত হয়েছে তাদের ক্রমিক সংখ্যা (Accession No.) উপযুক্ত ঘরে লেখা হয়। দ্বিতীয়তঃ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি ডকুমেণ্টের জন্য একটি করে কার্ড করে রাখা হয় এবং আলোচিত সমস্ত বিষয়ের সংকেতের মারফৎ ঐ কার্ডের সংগে সংযুক্ত করা হয়।

(খ) একক পদ্ধতি (Uniterm system)

একক পদ্ধতি বা Uniterm system একটি পদের (Term entry) সংলেখ যা নির্দ্দেশকরূপে আমাদের নিকট ধরা পড়ে। মর্টিমার টব (Mortiner Taub) ১৯৫৩ সালে এই নির্দ্দেশক পদ্ধতি চালু করেন। Uniterm system নামটির মধ্যেই বোঝা যায় যে, জটিল বিষয় নামের পরিবর্ত্তে একটি কার্ডের উপরের দিকে বিষয় নাম (Subject heading) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তথ্য কেন্দ্রে সমস্ত নথিপত্রের জন্য কার্ড তৈরী করতে হয়, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Document profile. প্রত্যেকটি কার্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা রাখা হয়। এছাড়া কার্ডে Document এর পরিচয় এবং নির্দ্দেশকের জন্য শব্দ থাকে, ইংরাজীতে যাকে Descriptor বলে। এতে প্রতিটি ধারণা বা concept নির্দ্দেশক পদ (Index term) কার্ডের উপরে লেখা থাকে এবং নিচের বাকী অংশ দশভাগে ভাগ করা হয়, তা শুরু হয় ০—৯ পর্য্যন্ত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত সংখ্যা ০ দিয়ে শেষ হয়, তা ০ এর ঘরে থাকবে, যেমন ১০, ২০, ৫০, ১০০ ইত্যাদি। তেমনি ৪ দিয়ে যে সংখ্যা থাকবে, তা ৪ এর ঘরে থাকবে। নির্দ্দেশককরণের সময় Heading স্থির করে সংশ্লিষ্ট কার্ডগুলো তুলে নেওয়া হয়। নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণের পর বাকী কার্ডগুলো রেখে দেওয়া হয়। একক পদ্ধতি

পুরোপুরি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা খুব বড় গ্রন্থাগারে সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে কিছু Modification করে বা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতিতে নির্দ্দেশক প্রস্তুত করা উচিত। আমার মনে হয় যে কোন নির্দ্দেশকের ক্ষেত্রে কতটা সহজভাবে বিষয়ের জগতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাবে সেটিই বিবেচ্য। বিশেষ গ্রন্থাগারে একক পদ্ধতির প্রয়োগ লাভ জনক হবে। এক কথায় এরূপ প্রধান কাজটি হচ্ছে কোন ডকুমেন্টের বিষয় সূচীকে ভাল করে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট ধারণাগুলোকে এককে নিয়ে (isolate) আসতে এবং এভাবে যদি পাঁচটি ধারণাকে বেছে নিয়ে তাদের পাঁচটি নামকরণ (term) করে দিতে পারি তবে পাঁচটি ধারণাযুক্ত বিষয়ের জন্য পাঁচটি কার্ড তৈয়ারী হয়ে যাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন entry প্রস্তুতি-করণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। যাই হোক কোন ডকুমেন্টের বিষয় সম্পর্কে সব entryর বিবরণ দেবার পরিবর্ত্তে অদ্ভুতভাবে নামকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠক তার নির্দ্দিষ্ট তথ্য পেয়ে যাবে, আর এতেই একক পদ্ধতির নির্দ্দেশকের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

এবার এই পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক এবং তাহলে এর ভাল মন্দ দুদিকই আমাদের চোখে ধরা পড়বে।

সুবিধা :—

(১) সিসটেমটি খুবই সহজ এবং অত্যন্ত কম সময়ে নির্দ্দেশকরণ করা যায়।

(২) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর ধারণা অনুযায়ী ইচ্ছামত সমন্বয় ঘটিয়ে তথ্য পাওয়া যায়। সমন্বয়ের ক্রম (Citation order) কি হবে এ নিয়ে গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের চিন্তা করতে হবে।

(৩) গ্রন্থাগারে বইপত্রের সংখ্যা বাড়লেও কার্ডের সংখ্যা সেই হারে বাড়াতে হয় না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রথম ৮০০ বইএর নির্দ্দেশক প্রস্তুতিকরণের পর নূতন শীর্ষপদ (Heading) এর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ কম লাগে।

(৪) এই সিসটেম বিশেষ গ্রন্থাগারের পক্ষে খুবই উপযোগী।

অসুবিধা :—

(১) এই সিসটেমটি সহজ হলেও পুরোপুরি দোষমুক্ত নয়। কার্ডের নির্দ্দিষ্ট আকারের জন্য যত ইচ্ছা সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যা লেখা যায় না।

সাধারণতঃ দেখা গেছে ১০ হাজারের বেশী ডকুমেন্ট হলে এই সিসটেমের নির্দ্দেশক অকেজো হয়ে পড়ে।

(২) ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে এবং ভুলের সমন্বয়ের দরুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৩) এটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে—শব্দের একই বানান বিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দ।

সমার্থক শব্দ (Synonym) প্রভৃতির সমস্যাও আছে। এটা মনে রাখা ভাল যে, নির্দ্দেশকের সমস্যা দূর করবার জন্য Link, Roles, Weighting প্রভৃতি উপায় আছে।

শিরোনাম নির্দ্দেশক ঃ

ইংরাজীতে একে Title Index বলা হয়। প্রবন্ধের Title এ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বাছাই করে এর সাহায্যে তৈয়ারী হয় এই ধরণের নির্দ্দেশক। এই নির্দ্দেশককে ইংরাজীতে Kwic Index বলা হয়। যেহেতু এই ধরণের নির্দ্দেশক শিরোনাম নির্ভর, সেইহেতু শিরোনামগুলো যথাযথ হওয়া দরকার।

Kwic নির্দ্দেশকের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে তিনটি অংশ যেমন—Keyword, Context এবং পরিচয় সংখ্যা। Keyword আক্ষরিক ক্রমে সাজানো থাকে এবং এর সাহায্যেই নির্দ্দেশকে প্রবেশ করা যায়। Keyword ছাড়া অন্যান্য শব্দগুলো পটভূমি প্রস্তুত করে। Indentification number বা পরিচয় সংখ্যা দ্বারা লেখাটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এখানে নীচের একটি উদাহরণে 'Retrieval' কথাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা Keyword, অন্য শব্দগুলো Context এর সন্ধান দেয় এবং পরিচয় সংখ্যার মাধ্যমে ডকুমেন্টটি খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন Retrieval/ Automatic Information Organisation. আরেকটি উদাহরণ দিলে Kwic সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে। যেমন 'Use of role and links in Indexing' এর Keyword হলো 'Indexing' 'Roles' এবং 'Links' এবং এর পরিচয় সংখ্যা 16. সুতরাং এক্ষেত্রে Kwic সিসটেম দ্বারা নির্দ্দেশক প্রস্তুত করা হয়, যেমন ঃ—

Indexing / Use of role and links in........................16

Links in indexing / Use of roles and 16

Role and links in indexing / Use of 16

Kwic এর নির্দেশক আবার ঘুরিয়েও করা যায়, যেমন—

and links in indexing/use of roles........................16

of roles and Links in indexing/use........................16

indexing/use of roles and links in 16

KWIC Index এর মূলনীতিকে ভিত্তি করে আরো কয়েক রকম নির্দেশক প্রকার ভেদে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। KWIC (Keyword out of context) KWWC (keyword with context) SWIFT (Selected word in full Title)।

এমন ধরনের নির্দেশকের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক—

Automatic	Automatic Information Retrieval......17
Information	Automatic Information Retrieval......17
Retrieval	Automatic Information Retrieval......17

অনেক সময় এধরণের নির্দেশকে (Keyword) লাইনের বাইরে না লিখে শিরোনামের উপরে লেখা হয়ে থাকে।

Automatic

Automatic Information Retrieval......17

Information

Automatic Information Retrieval......17

Retrieval

Automatic Information Retrieval......17

KWAC বা Keyword and Context অথবা Keyword Augmented in Context দুইই হয়। এই পদ্ধতিতে শিরোনামকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Keyword) যোগ করা হয় Biological Abstracts এর CBAC Index এ (Chemical Biological Activities) এধরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্লিক সূচী (KLIC Index) :—

KLIC এর বিস্তৃতি নাম Key Letters in Context এই সিসটেম সাধারণত কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ এক

একটি নির্দ্দেশকের লাইনে থাকে। ফলে শিরোনাম দীর্ঘ হলে অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে নির্দ্দেশক প্রস্তুত করতে হয়।

কিটার্ম্ নির্দ্দেশক (Key Term)

এটি হচ্ছে Keyterm Alphabetical. এইটি নির্দ্দেশক Oceanic Abstract পত্রিকার সূচি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই নির্দ্দেশককে সম্পূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার করা হয় না। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ—

Contracts , Launching , Shipbuilding
Launching , Shipbuilding , Contracts
Shipbuilding, Contracts, Launching

WADEX—এই সিসটেমের আসল নাম word and Author Index. এই পদ্ধতিতে লেখকের নামও গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসাবে ধরা হয়। যেমন ওয়াডেক্স Applied Mechanics Review পত্রিকার নির্দ্দেশকে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের আলোচিত নির্দ্দেশক ছাড়াও কিছু নির্দ্দেশক সিসটেম রয়েছে, তা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে শুধুমাত্র প্রচলিত নির্দ্দেশক-গুলোর এক সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল। এখানে কয়েকটি নির্দ্দেশকের নাম উল্লেখ করে বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবো। এই নির্দ্দেশকগুলো হচ্ছে ঃ—KWWC (Keyword with context), DKWIC (Double KWIC) Basic (Biological Abstracts Subject in context), SWIFT (Selected in Full Title) ইত্যাদি।

References

1. Austin D.—PRECIS. Lib. Sc. 1975 12(4).
2. Bhattacharya, G.—POPSI. Lib. Sc. Doc. 1979 Pap. A.
3. Chakraborty, A. R. & Chakraborty, B.—Indexing 1984.
4. Guha, B. ঃ—Documentation and Information 2d ed. 1982.
5. Chakraborty, A. R.—Tathya Bijnaner Ruprekha 1986.
6. Ranganathan, S. R.—Chain procedure and dictionary catalogue. Annals of Lib. Sc. 1954.
7. Tanbe, M.—Notes on the use of roles and links in co-ordinating indexing Amer. Doc. 1961. 12, 98—100

দশম অধ্যায়

তথ্য উদ্ধারের দিক

তথ্যের সমাযোজন বাদ দিয়ে তথ্য বিষয়ে কিছু বলার অর্থ হয় না। সমাযোজন প্রক্রিয়াই হচ্ছে তথ্য উদ্ধারের মূল দিক। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যে তথ্য উদ্ধার করি তাকে যদি সমাযোজন করা না যায় অর্থাৎ তাকে যদি প্রয়োজনে তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দিতে না পারি তবে বুঝতে হবে তথ্য উদ্ধারের সমগ্র প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। তাই তথ্য আলোচনা মানেই তথ্য সমাযোজন (Communication) আলোচনা। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাছে সমাযোজন প্রক্রিয়াটি একটু স্বচ্ছ হওয়া দরকার—এখন দেখতে হবে—প্রক্রিয়া ব্যাপারটি কি? প্রক্রিয়া হচ্ছে কোন সময়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বা দৃশ্যমান বিষয়ের চলমান অস্তিত্ব (Time dependent phenomenon)। সমাযোজন প্রক্রিয়া আমাদের সামাজিক জীব হিসাবে বেঁচে থাকার সহায়ক শক্তি।

সমাযোজন প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ যা তথ্যের আকার নিয়ে একটি জ্ঞেয় বিষয়ের সূত্র থেকে অন্য একস্থানে পেঁছে দেয়। একথা ঠিক তথ্যের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্যের অভিব্যক্তি, তথ্যের বিশেষ ধর্ম এবং তথ্য আদান প্রদানের ফলাফল। এটা অনেকটা বৈদ্যুতিক পদ্ধতির অনুরূপ বা পদার্থ বিদ্যার মাধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষের মত যেগুলি আমদের পক্ষে সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন অথচ প্রতিমুহূর্তেই এগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হয়। অর্থাৎ আমরা বৈদ্যুতিক ব্যবহারের বিভিন্ন দিকগুলো তাদের বিশেষ ধর্ম ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকি। তেমনি তথ্যের ব্যাপকতা এতই বিশাল তাকে কোন সংজ্ঞা দিয়ে বা সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। অথচ তথ্যকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। সেই প্রাচীন যুগ থেকে ধীরে ধীরে তথ্য আদান প্রদান বা সমাযোজনের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে সভ্যতার আলো দেখছি।

তথ্য উদ্ধারের পদ্ধতি ও তার সংজ্ঞা সমাযোজন প্রক্রিয়া কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে চলে। তথ্য উদ্ধারের তারতম্যের মধ্যে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতি।

তথ্য উদ্ধার পদ্ধতি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক। তথ্য উদ্ধার পদ্ধতি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক ধারণার সংযোজন দেখা যায়। যাহোক আমাদের গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্য তথ্য উদ্ধার বিষয়টির একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি—

তথ্য উদ্ধারের কাজ এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয় যা তথ্য ব্যবহারকারীর অনুরোধে গ্রন্থাগারিক বা তথ্য বিজ্ঞানী কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য নিয়ে এসে তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেন।

আমরা গবেষণালব্ধ নথি, হস্তলিপি এবং অন্যান্য নথি প্রভৃতি সেখান থেকে সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনে সমাযোজন (Communicate) করে থাকি। এ সমস্তই হয়ে থাকে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে। এই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার অন্যান্য নথির সঙ্গে মাইক্রোফিল্ম, ফোটগ্রাফস্, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদিও পাঠককে আমরা সরবরাহ করে থাকি।

তথ্যপ্রেরণ ব্যবস্থা (Transmission of Information)

সেনন (shanon) নামক এক তথ্য বিজ্ঞানী প্রথম তথ্যতত্ত্বকে একটি শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সমাযোজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পাঁচটি উপাদান। (ক) সূত্র—তথ্য প্রস্তুতকারক (খ) প্রেরকযন্ত্র যা তথ্যকে সুসংগঠিত করে যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে (গ) তথ্য গমনাগমনের পথ (Channel) যার মাধ্যমে তথ্য চলাচল করবে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে (ঘ) গ্রহণকারী (Receiver) যা স্পষ্ট করে তথ্যকে পরিবেশনের উপযোগী করে তুলবে (ঙ) গন্তব্যস্থান (Destination) এখানে তথ্য তার গন্তব্যস্থল পেয়ে যাবে এবং তথ্য সদ্ব্যবহারের উপায়ও পেয়ে যাবে। রেখাঙ্কিতভাবে পদ্ধতিটি বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে —

উদ্দীপক / Stimulus — Source / সূত্র — Message / সংবাদ — Transmitter / প্রেরক

Transformation of Message / সংবাদের পরিবর্ত্তন — Channel / গমনাগমনের পথ — Receiver / গ্রহণকারী

Recouverted or Recorded Message / সংবাদ বা তথ্যের নিকট পৌঁছানোর কৌশলগত পরিবর্ত্তন — Destination / গন্তব্যস্থল—Response / সঠিক উত্তর

গ্রন্থাগারে যে সকল নথির সংগ্রহ রয়েছে সেগুলো তথ্য সমৃদ্ধ আর এগুলোর সূত্রপাত হয়েছে তাদের মানবরূপী লেখকদেব মস্তিষ্ক থেকে। এ সকল নথি পাঠকের কাছে প্রেরিত হয়েছে গ্রন্থাগারের কাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগারে নথি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সূচীকরণ ও বর্গীকরণ করা হয় এইভাবে নির্দেশকের কাজও সম্পন্ন হয়। গ্রন্থাগারের সমস্ত প্রক্রিয়ার পর নথিগুলো সঠিক স্থানে সংগৃহীত করে রাখা হয় যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনে নথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রথমদিকে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাগারে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হবে এবং এরপর সে আশা রাখবে যে গ্রন্থাগারে এসে সে আরো নতুন নতুন নথির মাধ্যমে আরো নতুন নতুন তথ্য পাবে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিককে সমাযোজন (communication)-এর কাজটি খুব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। যদি পাঠককে সমাযোজন ক্রিয়াটি সরাসরি ক্যাটালগের মাধ্যমে দিতে হয় তবে ক্যাটালগটি হওয়া উচিত সহজাত ভাষায় সমৃদ্ধ এবং সেইসঙ্গে পাঠক নির্দেশকটি স্বাভাকিব ভাষার মাধ্যমে দেখে তৃপ্ত লাভ করবে।

আমাদের জানা উচিত নির্দেশক (Index) এবং ভষা এবং প্রতিদিনকার ভাষার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এখানে গ্রন্থাগারের তথ্য উদ্ধারের পদ্ধতির একটি রূপরেখা (Diagram) দেওয়া গেল, তার মাধ্যমে আমাদের তথ্য উদ্ধার সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হবে।

তথ্য উদ্ধার পদ্ধতির কাজ (Function of Information retrieval) :

আমরা যারা তথ্যবিজ্ঞানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি তারা তথ্য উদ্ধার পদ্ধতির পাঁচটি মূল কাজের কথা সর্বদা অনুসরণ করি এবং যতটা সম্ভব কাজ বা সেবার প্রক্রিয়াগুলো নিখুঁতভাবে করতে পারি তার মধ্যে আমাদের সার্থকতা প্রকাশ পায় এবং সেইসঙ্গে তথ্য বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত হয়।

(ক) **তথ্য সংগ্রহ**—যেমন বই, জ্ঞান রাজ্যের অন্যান্য নথি, ডেটা (Data) ইত্যাদি।

(খ) **তথ্য সমৃদ্ধ নথিগুলোর নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ**—যা তথ্য ব্যবহারোপযোগী করে সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের হাতে তুলে দেবার কাজ।

(গ) **প্রতিষ্ঠানের একটি ফাইল** (Organisational file)—এই ফাইলের মাধ্যমে জানা যাবে কেমন করে তথ্যের উপাদানগুলো সংগ্রহ করে সঠিক জায়গায় রক্ষিত হয়েছে।

(ঘ) **প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের পদ্ধতি**—যে পদ্ধতিতেই প্রশ্ন বা অনুসন্ধান করা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে তা যেন সুসংগঠিতভাবে করা হয়, আর তা নির্ভর করছে সঠিকভাবে তথ্যের ইনপুট (Request Profile) এবং অনুরোধের রেখাচিত্রের উপর।

(ঙ) **তথ্যের প্রচার বা তথ্যকে ব্যাপ্ত করা**—এটা নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্যের নথির সঠিক মূল্যায়ণ ও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুধাবন করে এবং ব্যবহারের উপযোগী করে পাঠকের সামনে পৌঁছে দেবার মধ্যে।

এটি সকলেই জানেন প্রতিটি তথ্যমূলক কাজ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক তথ্য উদ্ধারের কাজ করতে গেলে আমাদের উপরিউক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

আজ তথ্য উদ্ধারের কাজে সংখ্যাতত্ত্ব ও আঙ্কিক প্রয়োগের প্রবল আধিক্য দেখা যাচ্ছে, অবশ্য সবই তথ্যব্যবহারকারীর স্বার্থে হচ্ছে।

নথি উদ্ধার ও তথ্য উদ্ধারের স্বরূপ : (Document retrieval vs fact retrieval).

অনেক সময় নথি ও তথ্য একই বিষয় বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাই এখানে নথি ও তথ্য সম্পর্কে স্বল্প আলোচনা প্রয়োজন। বস্তুতঃ নথি বলতে বুঝি যার মধ্যে তথ্য রয়েছে। আর তথ্য বলতে বুঝি যা নথির ভেতর থেকে বের করতে হয়। ইংরাজীতে একেই ডেটা (Data) বলে। নথি কথাটি অতি ব্যাপক। আমাদের গ্রন্থাগারিক হিসাবে সবসময় সচেতন থাকতে হবে কি ধরনের তথ্য কোন কোন ধরনের নথির মধ্যে পাওয়া যাবে। তাই ডকুমেণ্ট বা নথি উদ্ধারের সঙ্গে তথ্যের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ যে ধরনের নথি আমরা যোগাড় করতে পেরেছি তা দিয়ে আজকের এই তথ্যভিত্তিক সমাজকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারবো। জ্ঞানরাজ্যে যে তথ্যের বিস্তৃতি ঘটছে তাকে গ্রহণ

বা বর্জন করে তথ্যবিজ্ঞানীকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

References

1. Guha, B.—Dcu nentation & Informati)n. 1983.
2. Sengupta, B. & Chatterjee M.—Documentation & Information retrieval 1977.
3. Khanna, J. K.—Library and Society. 1987.

একাদশ অধ্যায়

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত নির্দ্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি কথা

সমগ্র জ্ঞানরাজ্য দাঁড়িয়ে আছে, অতীতের গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর। তবে এরজন্য আগামীদিনের গবেষণার গুরুত্ব কমে না, বরং অতীতের জ্ঞানরাজি আধুনিক যুগের গবেষককে অনেক সচেতন করে। আমরা যে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখার জন্য পূববর্ত্তী গবেষণা লব্ধ তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি বা গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত হই এবং লেখার শেষে সেগুলো রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করি। এই প্রবন্ধগুলো বা গ্রন্থাদির তালিকা নূতন কোন গ্রন্থের বা প্রবন্ধের শেষে দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমান লেখকের অতীতের লেখকদের প্রতি স্বীকৃতি জানানো। ইংরাজীতে এধরনের নির্দ্দেশককেই Citation Index বা উল্লেখিত নির্দ্দেশক বলে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় Citation Index হচ্ছে বর্ত্তমানের যে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধের পূর্বপুরুষ।

সাইটেশন (Citation) নির্দ্দেশক ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সে সূত্র সন্ধান খুব সহজ ব্যাপার নয়। Derek de Solla Price বলেছেন যে, উল্লেখিত নির্দ্দেশক বা সাইটেশন Index কে অনেকে ফুটনোটও বলে থাকেন (Foot note), আর এই ফুটনোটকে প্রথমযুগে বলা হত 'Scholia', যার অর্থ হচ্ছে পাণ্ডিত্য সম্পর্কীত সম্পর্ক। ১৮৭৩ সালে Frank Shepard এই সাইটেশন নির্দ্দেশককে আইনবিষয় লেখনীতে কাজে লাগিয়েছেন। যাইহোক, সাইটেশন হচ্ছে তথ্য ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শণ করা, যার ফলে তথ্যব্যবহারকারীরা সেগুলোর মাধ্যমে তাদের বর্ত্তমান গ্রন্থটির বা প্রবন্ধের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ দূর করতে পারবে।

সাইন্স সাইটেশন নির্দ্দেশক—এজাতীয় নির্দ্দেশকের মূলে রয়েছেন ইউজেন গারফিল্ড (Eugene Garfield) এবং ইন্স্টিটিউট ফর সাইন্টিফিক ইনফরমেশন (Institute for Scientific Information)।

সাধারণ সাইটেশন ইনডেক্স—এই নির্দেশককে আমরা লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে থাকি। অনেক সময় একই লেখা একাধিক লেখক উদ্ধৃত করে থাকেন। সমস্ত উদ্ধৃত লেখাগুলোই citation index-এ স্থান পায়।

সোর্স ইনডেক্স (Source Index)—এই ধরণের নির্দেশককে বর্ণানুক্রমিকভাবে উদ্ধৃতকারী লেখকদের নাম ও সহলেখকদের নাম সাজানো থাকে। এছাড়া পত্রিকার নাম, সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদি থাকে।

সাইটেশন নিৰ্দ্দেশকের মাধ্যমিক ব্যবহার—

একজন পাঠক তার পাঠ্য বিষয়ের রসদ হিসাবে সাইটেশন নির্দ্দেশক ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং বলা যায় citation হচ্ছে লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা এবং কোন কোন সূত্র থেকে তিনি তাঁর বর্ত্তমান তত্ত্বের রসদ পেয়েছেন তা জানিয়ে দেওয়া। মাধ্যমিকভাবে সাইটেশন নির্দ্দেশকের ব্যবহার আরো যারা করেন, তারা হলেন গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থপঞ্জীকারক এবং ডকুমেণ্টালিষ্ট। একজন গ্রন্থপঞ্জীকারক তার কোন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জীটির পূর্ণরূপ দেবার জন্য citation নির্ঘণ্টের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

উচ্চমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রস্তুতিকরণ—

আমরা যদি কোন লেখকের লেখার শেষে যে সাইটেশন নির্দ্দেশকের সঙ্গে পরিচিত হই, তা অনুধাবন করে বুঝতে পারি, বর্ত্তমান লেখক উচ্চমানের সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন কিনা, বা কোন ধরণের ডকুমেণ্ট লেখক ব্যবহার করেছেন তাও জানতে পারি। Brown-এর Scientific Serials Fublication এ জাতীয় citation নির্দ্দেশকের মধ্যে পড়ে।

উচ্চমানের তালিকার ব্যবহার—

একথা সঠিকভাবেই বলা যায়, উচ্চমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকার Citation Index-এর সাহায্যে তথ্যকেন্দ্রের জন্য যথাযথ সাময়িক পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা সম্ভব। এটা ধ্রুবসত্য যে উচ্চমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে সাধারণতঃ সঠিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় এবং পক্ষপাতহীন পিরিয়ডিকালসের তালিকা সংগ্রহের উপর গবেষণার গতি সাবলীল পথে এগোতে পারে।

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের ব্যবহার—

আমরা Citation শিরোনাম ও Citation তালিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করি এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হই। অর্থাৎ যে সকল নথি বা ডকুমেন্টগুলো Citation Index-এর মাধ্যমে উদ্ধার করি তাতে বহু অজ্ঞাত বিষয় আমাদের গবেষকদের নতুন আলোর সন্ধান দেয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নথিগুলোর নতুন জীবন দান—

সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে উল্লিখিত নির্দেশকের (Citation Index) মাধ্যমে যে নথিগুলির সন্ধান গবেষক পায়, সেগুলোকে নতুনভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গবেষক নতুন জীবন দান করেন।

উল্লিখিত নির্দেশকের (Citation Index) সাহায্যে পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের নির্ভরতা—

এই নির্দেশক ব্যবহারিক প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিবিদ্যা, পশুপালনবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিষয়ের উৎস সন্ধানে উল্লিখিত নির্দেশকের ভূমিকা—

Citation Index আমাদের পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করে। "Encyclopaedia of Library and Information Science"-এর অন্তর্গত একটি অর্থনীতির বিষয়ে প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতি সম্পর্কে কোন reference দেননি। তাঁর কাজ 'Wealth of Nations' এর উপর বস্তুতঃ কোদ reference দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই বইটি Economics-এর প্রথম বই বলে পরিচিত। এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন Adam Smith-এর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল এবং এর মধ্যেই 'Wealth of Nations'-এর সমস্ত রসদ ছিল। সুতরাং যদি এই বইটি সম্পর্কে উদ্ধৃতিমূলক কোন বিশ্লেষণ করতে হয়, তবে বলতে বাধা নেই, এই বইটির বিষয় হচ্ছে একটি মৌলিক চিন্তা এবং এর উৎসমূলের সন্ধান পাওয়া যাবে অন্যান্য বিষয় থেকে।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভেতরের প্রবন্ধাদির সংক্ষিপ্তসারকরণ ও নির্দেশক প্রস্তুতিকরণের মধ্যে Citation Index-এর প্রয়োজনীয়তা লুক্কায়িত রয়েছে।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে যে সমস্ত সংক্ষিপ্তসার এবং নির্দেশক পাওয়া গিয়েছে সেগুলো গবেষণার পক্ষে খুবই উপযোগী।

উল্লিখিত নির্দেশকের সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীর সংযুক্তিকরণ পদ্ধতি—

ইংরাজীতে একে Citation Indexing with Bibliographic coupling বলা হয়। তথ্য উদ্ধারে কম্পিউটারের ব্যবহারের আশু প্রয়োজনে এবং সুফল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হলে নথির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে বিশেষ কতকগুলো প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় এবং এক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ কৌশল কিছুটা সময়সাপেক্ষ। যদিও Bibliographic Coupling পদ্ধতি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। তবে আগামী দিনের তথ্য-সমাজে এ পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী ম্যাসাচুসেট্স ইন্স্টিটিউট অব্ টেকনোলজী'র M. M. Ressler এই Coupling বিষয়টির স্বরূপ আমাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তার মতে যদি দেখা যায় কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকার Citation দুই প্রবন্ধের মধ্যে একই ধরণের রয়েছে, তাহলে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলতঃ একই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুই প্রবন্ধ একই, বিষয়বস্তুর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশমাত্র।

বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লিখিত নির্দ্দেশকের ভূমিকা—

Scientific Citation Index-কে তথ্য খোঁজার কাজে লাগাতে হলে কয়েক অংশের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। প্রথমে যে বিষয়ে তথ্য খুঁজতে হবে, সে বিষয়ের উপর লেখা হয়েছে এমন একটি লেখাকে চিহ্নিত (identify) করতে হবে। আমরা জানি যে, কোন বিশেষজ্ঞ এ ধরনের কোন না কোন লেখার সঙ্গে পরিচিত। আর যদি পরিচিত নাও হয়ে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ জাতীয় একটি লেখা বের করে নেবেন। এই তথ্য উদ্ধার করবার পর বোঝা যাবে, কে বা কারা উদ্ধৃত লেখাটি সাইটেশন করেছেন। এই সূত্র (clue) পাবার পর Source Index-এ সেই লেখাটির (citing paper) বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি সম্পর্কে যদি তথ্যবিজ্ঞানী একবার সচেতন হয়ে পড়েন, তবে তাকে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী করবে এবং তিনি তা খুঁজেও বার করতে সক্ষম হবেন।

Scientific Citation Index নির্দ্দেশক প্রস্তুতিকরণের ইতিহাসে এবং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। প্রচলিত নির্দ্দেশকরণের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা থেকে Citation Index সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে নির্দ্দেশকরণের পদ্ধতিগত প্রয়োগ-কৌশল একেবারেই অচল। খুব বেশী মেধারও প্রয়োজন হয় না। প্রচলিত নির্দ্দেশকের মধ্যে যে বিভিন্নরকম শব্দের প্রয়োগ করতে হয় সেগুলোর এখানে প্রয়োজন হয় না। যান্ত্রিক উপায়ে Citation Index-এর কাজ সমাধা করা যায়। Scientific Citation Index আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কতটা প্রয়োজন একথা ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু Bradford এর সূত্র থেকে জানতে পারি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র-পত্রিকার বিশ্লেষণ SCI করে থাকে সেজন্য এর উপযোগীতাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান আর কোন একটি শাখা বা Discipline-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। একাধিক বিষয়ের সংমিশ্রণে এবং একে অন্যের উপর নির্ভরতায় নতুন নতুন বিষয়ের জন্ম নিচ্ছে (Inter Disciplinary Subjects), যার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের রাজ্যে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। যারা মনে করে SCI গবেষণার ক্ষেত্রে খুব বেশী সহায়ক নয় তাদের মনে রাখতে বলি যে, কোন একটি সুক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা থাকলে সেটির মধ্যে দিয়ে অন্যান্য তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরাও জানতে পারবেন তাদের তত্ত্ব অন্য কোথাও ব্যবহার বা সমালোচনা হয়েছে কিনা।

সর্বশেষ বলা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত নির্দ্দেশক (Citation Index) পৃথিবীতে বিভিন্ন সুক্ষ্ম বিষয়ের অগ্রগতির গতি-প্রকৃতি জানিয়ে দিতে সাহায্য করে।

References

1. Guha, B—Documentation & Information 1983.
2. Chakraborty A R. & Chakraborty B—Indexing 1984.
3. Foskett, A. C.—The Subject approach to Information ; 4th ed. 1982.
4. Garfield, E—Citation Indexing, 1979.

দ্বাদশ অধ্যায়

তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ও তথ্যবিজ্ঞান

ইংরাজী বিব্লিওমেট্রিক্স্ কথাটি বাংলা পরিভাষায় দাঁড়ায় তথ্যপঞ্জী পরিমাপক। আধুনিক যুগে বিব্লিওমেট্রিক্স্ বিষয় হিসাবে তথ্য-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব ও পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিব্লিওমেট্রিক্স্ ছাড়া তথ্য উদ্ধারের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। ও' কোনার (O' Connor) ও ভূস (Voos)-এর মতে, বিব্লিওমেট্রিক্সের পরিধি নির্ণয়ের কৌশল দেখা যাবে নথিপত্রাদির পরস্পরের সম্পর্ক স্থিরীকরণের মধ্যে বা তাদের বর্ণনার মধ্যে (যেমন উদ্ধৃতি স্বরূপ উল্লিখিত নির্দেশক ইত্যাদির মাধ্যমেও আমরা বিব্লিওমেট্রিক্স ব্যবহার করতে পারি)। বিশেষভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক প্রকরণ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বিষয় বা ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক পদ্ধতির সাহায্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। প্রয়োগ কৌশল ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সামাজিক এবং বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির মধ্যে। বিজ্ঞান বিষয় নীতি নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের কর্মপদ্ধতির পরিমাপ ও তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের মাধ্যমে হতে পারে। তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) মূল এককগুলো স্পষ্ট করে দেখা যাবে, যখন বিভিন্ন বিষয়ের লিপিবদ্ধ রূপকে আমরা সমাযোজন করে থাকি, যেমন প্রবন্ধ এবং তার বস্তু সংক্ষেপ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পত্র-পত্রিকার সাহায্যে প্রকাশিত হবার সময়, প্রবন্ধাদির তথ্যপঞ্জী ও প্রকরণ গ্রন্থ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রকাশিত হবার সময় বিব্লিও-মেট্রিক্স্ বা তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রতিদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় এবং পরস্পর আরোপিত বিষয়ের উপর যে জটিলতা ও অত্যাধুনিকতা এসে পড়েছে তার প্রতিবিধানে তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের ভূমিকা অপরিসীম। বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্যমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ডাটা সংগ্রহ করে থাকে এবং এভাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত নির্দেশকের কাজ করে। লোৎকা (Lotka), গ্রস (Gross), ব্রেডফোর্ড (Bradford), জিপফ (Zipf), ডেরিক জে. ডি.

সোলা প্রাইস (Derec J de Solla Price), বুকষ্টিন (Bookstein), মাণ্ডেলব্রট (Mandelbrot), ব্রুকস (Brooks), নারীন (Narin), গারফিল্ড (Garfield), ভিকারী (Vickery), মোরাভসিক্ (Moravos.k), প্রিচার্ড (Prichard), ডোভরভ (Dovrov), ভ্লাচি (Vlachy), হিউম (Hulme), ফেইদর্ন (Faithorne) এবং অন্যান্য অনেকেই তথ্য পঞ্জীকরণের বিষয়ের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে নানা ধরণের প্রয়োগ কৌশল তত্ত্ব অতীতে দিয়ে গিয়েছেন, যা তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আজ যে তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) কথা আমরা আলোচনা করছি, তার উৎস হচ্ছে উল্লিখিত তথ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফসল। পূর্বে এইসব তথ্য-পঞ্জীকরণে তাদের তত্ত্বের প্রয়োগ কৌশলের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ তথ্যকে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সমাযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) শব্দটির উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে এটি একটি আধুনিক শব্দ, যা তথ্যবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে চলেছেন। ডঃ রঙ্গনাথন লাইব্রামেট্রিক্স বা গ্রন্থপরিমাপক কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং এর সদৃশ শব্দ বা অনুরূপ শব্দ হিসাবে বর্ত্তমানে আমরা পাই, তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) শব্দটি। এভাবেই আমরা পেয়েছি রাশিয়ান ধারণা সাইন্টোমেট্রিক্স (Scientometrics) বা বিজ্ঞান পরিমাপক শব্দটি। এরপর এফ. আই. ডি. (FID) ইনফর-মেট্রিক্স (Informetrics) বা তথ্য পরিমাপক কথাটির ব্যবহার শুরু করেছে এবং এই শব্দটি এখন বহুল ব্যবহৃত। অন্যান্য বিষয় যে অর্থনীতি-পরিমাপক (Econometrics), মনস্তত্ত্ব পরিমাপক (Psychometrics), সমাজতত্ত্ব পরিমাপক (Sociometrics) এবং জীববিজ্ঞান পরিমাপক (Biometrics) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অঙ্কন ও সংখ্যাতত্ত্ব প্রয়োগের ফলে বহু জটিল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজতর হয়েছে এবং তথ্যবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ইতিহাস, অনুনীতি, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের গুরুতর সমস্যাগুলো উপরিউক্ত বিষয়ের পরিমাপক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে অতি সহজেই সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।

তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) Prichard এই শব্দটি ১৯৬৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছেন। অথচ সে সময়ে Statistical Biblio-

graphy বা গ্রন্থপঞ্জী পরিমাপক শব্দটি তথ্যবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু প্রিচার্ড (Prichard) অনুভব করলেন যে Statistical Bibliography শব্দটির মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক একাধিক শব্দের মানে বোঝাচ্ছে এবং এর ফলে সংখ্যাতাত্ত্বিক গ্রন্থপঞ্জীকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। তিনি সংজ্ঞা দিয়ে দেখালেন যে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) হচ্ছে বই এবং অন্যান্য সমাযোজন মাধ্যমগুলোর উপর আঙ্কিক প্রয়োগ যা সমস্ত রকম তথ্যের সমাযোজন প্রক্রিয়ায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে দেবে। তথ্যের প্রকৃতি ও ক্রমাগত উন্নতিই শুধু তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) দেখাবে না, সেই সঙ্গে তথ্য-সমাযোজন প্রক্রিয়ার গুণগত মান উন্নত হবে। বিভিন্ন লিপিবদ্ধ বিষয়ের সঠিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাযোজন করার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) সার্থকতা নির্ভর করে। ফেয়ারদরুণের (Fairthorne) মতে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) হচ্ছে নথিভুক্ত আলোচিত বিষয় সমূহের গুণাবলীর এবং ব্যবহারিক কার্যকলাপের উপর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ কৌশল। তথ্যবিজ্ঞানী রেইসিগ (Raisig) ১৯৬২ সালে সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জীর (Statistical Bibliography) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় তিনি বলছেন, "বই এবং সাময়িক পত্রপত্রিকা সংখ্যাতত্ত্বগতভাবে একত্রীকরণ এবং তাদের বিশদ ব্যাখ্যা ইত্যাদির সঙ্গে নথিপত্রাদির ও পুস্তকাদির ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতি প্রদর্শন করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের অবস্থান ঠিক করা এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক গবেষণার মান অনুযায়ী এসব বই ও পত্রিকা ব্যবহারকারীদের নিকট পেঁছে দেবার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) সংজ্ঞা পাওয়া যায়। রেইসিগ (Raisig)-এর সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী (Statistical Bibliography) আজকে তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। হকিন্স (Hawkins) ১৯৭৭ সালে অনলাইন তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) সম্পর্কে তার গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যা বক্তব্য রেখেছেন, তা হচ্ছে বইপত্রের গ্রন্থপঞ্জীর আকৃতির উপর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই হচ্ছে বিবলিওমেট্রিক্স বা তথ্যপঞ্জী পরিমাপক।

নিকোলাস (Nicholas) এবং রিচি (Ritchie) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে জ্ঞানের আকৃতি বিষয়ে তথ্য আহরণ করা এবং সেই

তথ্য সমাযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics)-কে পাওয়া যায়। এরা আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, "তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) দুটো বড় ভাগে দেখানো যায়—প্রথমভাগে দেখানো যায়, বিভিন্ন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতিগত বৈচিত্র। দ্বিতীয় ভাগে দেখানো যায়, বিষয়গুলোর ভেতরের অংশগুলোর মধ্যে তাদের পরস্পর সম্পর্ক। খুবই আধুনিক একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন পটার (Potter) নামে একজন তথ্যবিজ্ঞানী। পটারের তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) হচ্ছে যে সমাযোজন (Communication) যোগ্য প্রকাশনাগুলোর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের লেখকদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পরিমাপ করার পদ্ধতি। বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) পদ্ধতি গভীরভাবে অনুধাবন করে কতকগুলো মূল প্রক্রিয়া—যেমন আঙ্কিক নিয়ম প্রয়োগ করে প্রকাশিত ছোট ও বড় দ্রব্যাদির সংগঠন। বর্গীকরণ এবং সংখ্যার তাত্ত্বিক মূল্যায়ণ এবং লেখকবৃন্দসহ সেগুলো যথাযথ সমাযোজন করাই হচ্ছে তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Bibliometrics) মূল লক্ষ্য। যদিও তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics) কথাটির উৎপত্তি খুব বেশীদিনের নয়, তথাপি সূত্রটির ব্যবহার প্রচলিত হয়ে আসছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে—কখনো এর নামকরণ হয়েছে সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী যা নাকি ইংরাজীতে Statistical Bibliography বলে প্রচলিত ছিল। আবার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন হিউম (Hulme)। এই সঙ্গে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, এই পদ্ধতি কোনো নাম ব্যবহার না করেও প্রচলিত ছিল।

কতগুলো মৌলিক তত্ত্ব বা অনুশাসন যা আজ তথ্যপঞ্জী পরিমাপককে (Bibliometrics) একটা শক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে লোৎকার (Lotka's Inverse Sequence Law of Scientific Productivity.) বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের বিপরীত বর্গ অনুশাসন, জিপফের (Zipf's Law in Linguistics) ভাষার অনুশাসন এবং ব্রেডফোর্ডের (Bradfords') Law of Scattering of Scientific Papers ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদির উপর অনুশাসন।

উপরিউক্ত এই তিনটি অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের (Biblometrics) আবির্ভাব ঘটেছে। এখন দেখা যাক (ক)

কোন কোন লেখক কোন বিষয়ে কত সংখ্যক কাজ করেছেন, (খ) কোন বিশেষ নথিতে শব্দের প্রয়োগ কত পরিমাণে এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, (গ) সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশনার পর জ্ঞানের কোন কোন বিভাগে তাদের ব্যাপ্তি ঘটেছে বা কোন জার্নালে কত সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তারও একটি মূল্যায়ণ করা দরকার।

লোৎকা আমাদের দেখিয়েছেন কেমন করে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধগুলো একে অন্যের উপর সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। এসব প্রবন্ধ লেখকরা বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তরান্বিত করছেন, আঙ্কিকভাবে লোৎকার তনুশাসন (Lotka's Law) দাঁড়ায়—

$$X^n \frac{1}{4} \text{ .... } (1)$$

$a X^n Y=C$; যেখানে Y পুনঃ পুনঃ একটি করে প্রবন্ধ n সৃষ্টি করছে, প্রবন্ধে গতি C এখানে ধ্রুবক হয়ে রয়েছে।

জিপফ (Zipf)-এর অনুশাসন প্রস্তাব করছে এমন একটি সমীকরণ, যেখানে উঁচু ও নীচু পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত শব্দ লম্বা লিপিবদ্ধ নথিতে স্বাভাবিক ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে একটা লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাঁর অনুশাসন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, বড় প্রাসঙ্গিক বিষয় সাজানোর মধ্যে শব্দ পুনঃ পুনঃ কমতে থাকে, তবে শ্রেণীভুক্ত যে কোন মাত্রায় শব্দগুলো পুনঃ পুনঃ বিপরীতার্থক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় প্রবন্ধগুলোতে আসে এবং স্থান করে নেয়। আঙ্কিকভাবে জিপফের অনুশাসন (Zipf's Law) নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায়—

$$rd \frac{1}{8} \text{ or } rf=C \text{ ধ্রুবক}$$

যেমন r উচ্চমাত্রিক শব্দ, f-এর আবির্ভাব হয় পুনঃ পুনঃ এবং C ধ্রুবক।

ব্রেডফোর্ড (Bradford) ঘোষণা করেছেন যে তাঁর চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুশাসন শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ বিষয়ের সাময়িক পত্রপত্রিকায় পাবে তা নয়, বরং অন্যান্য সাময়িক পত্রপত্রিকায় এমন অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাদের চর্চা করাও তাদের প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে সেগুলো সংগ্রহ করাও তার অনুশাসনের একটি প্রধান কাজ। কারণ এইসব পত্রপত্রিকায় যে বিশেষ ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তা

আবার লোকচক্ষুর আড়ালে বা বিশেষজ্ঞের অজ্ঞাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্রেডফোর্ড আরও বলছেন, বিজ্ঞান বিষয়ে তালিকা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে তাতে বিশেষ বিষয়ের প্রবন্ধের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং সেজন্য আজ বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা অবলম্বন করে বিশেষ ধরণের সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রিকার ব্যাপ্তি ঘটছে সারা বিশ্বে। এই বিভক্তিকরণ অনিবার্য কারণেই ঘটছে, স্বাভাবিক ভাবেই যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রপত্রিকার আবির্ভাব ঘটছে, তখন বিশেষ বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্ম হচ্ছে। যখন সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সাময়িক পত্রপত্রিকা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করছে, তখন তার গতি হবে নিম্নরূপ—

$$1 : N : N^2 : N^3 : N^4 \ldots\ldots\ldots$$

দেখা যাচ্ছে, তথ্যপঞ্জী পরিমাপক (Bibliometrics)-এর উপর যে সমস্ত বইপত্র গত পাঁচ দশক ধরে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বেরুচ্ছে, তার সবগুলোরই ভিত্তি ব্রেডফোরডের (Bradford) তথ্য ছড়িয়ে দেবার অনুশাসন (Law of scattering of scientific papers)।

অনেক মানকভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্বমূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সকল অনুশাসন নির্ভর প্রকাশিত নথিপত্র সমর্থন বা কিছুটা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন বা একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ইত্যাদির চেষ্টা হয়েছে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ অনুশাসন বা নিয়ম-নীতির আগমনের ফলে পূর্বোক্ত নথি-পত্রাদির কঠোর সমালোচনাও হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্যভিত্তিক মডেল প্রস্তুত করে তার উন্নতি বিধান করা হয়েছে। আমাদের এই মুহূর্ত্তে কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ অনুশাসনের কথা মনে পড়ছে যেমন—প্রাইসের (Price's Square Root Law of Scientific Productivity) বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতির বর্গমূল অনুশাসন, গারফিল্ড (Garfield's Law of Concentration), কেন্দ্রীভূতকরণ নীতি বা অনুশাসন, এবং সেনগুপ্ত'র (Sengupta's Law of Bibliometrics etc.) তথ্যপঞ্জী পরিমাপক অনুশাসন ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতির বর্গমূল অনুশাসনে (Square root Law of Price) আমরা দেখি যেখানে প্রাইস (Price) বলেছেন যে বর্গমূল

অনুশাসন অনুযায়ী সমগ্র বৈজ্ঞানিক লেখকদের অর্ধেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গারফিল্ডের কেন্দ্রীভূতকরণ নীতিতে দেখি যে, তিনি যুক্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন তার নীতিতে মৌলিকত্ব রয়েছে। তার মতে জার্নালগুলোর বা সাময়িক পত্রপত্রিকার কেন্দ্রীভূতকরণ ও তাদের থেকে শাঁস বের করাই হচ্ছে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানের বা সূত্র সন্ধানের মূল চাবিকাঠি। ডঃ সেনগুপ্ত তাঁর নতুন তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নীতি বা অনুশাসন সম্পর্কে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে দ্রুততার সঙ্গে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ঘটছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধগুলো প্রকাশনায় এবং ব্যবহারের সময়ের মধ্যে একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। এই দূরত্বকে কমানোর কাজ করবে তার তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নীতি। পাশাপাশি অনেক তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ছাঁচ বা প্রতিরূপের নক্সা তৈরী হচ্ছে যাতে উপরিউক্ত তথ্য সরবরাহের নীতিগুলোর মর্মার্থ আমরা অনুধাবন করতে পারি।

এখানে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের নাম উল্লেখ করছি যা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রুকের (Brooke's models) সংবর্গমান ছাঁচ। নির্দ্দিষ্ট রাশিকে যে শক্তিতে উন্নীত করলে অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট রাশির সমান হয়, তাই সংবর্গমান। তার সংবর্গমান ছাঁচের বা মডেলের মাধ্যমে ব্রুক বোঝাতে চেয়েছেন যে সামাজিক গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য একটি সমাজে সমগ্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ব্রুকস্ বলেছেন মিলিত বিষক্রিয়া প্রক্রিয়া যাকে ইংরাজীতে বলে "Mixed Poison Process". ব্রুকস্ এবং গ্রিফিৎস্ (Brookes & Griffiths) এর ছাঁচ বা মডেলের মধ্যে পাওয়া যায় পুনঃ পুনঃ সংগঠন, প্রেরণ ও সহজ প্রক্রিয়া। সহগ (Co-efficient) হচ্ছে বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশির পূর্ববর্ত্তী গণক। প্রাইসের (Price) মডেলকে সংক্ষেপে বলা হয় কেড (CAD—Commulative Advantage Distribution) বা ক্রমবর্দ্ধমান তথ্য বণ্টনের সুবিধা যেখানে তিনি লাভ করেন গ্রীক বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণের নঞর্থক কার্যাবলী। ব্রুকষ্টিনের (Brookstein) মডেলে তিনটি মূল নীতির সংযোগবিধান করে একটি নীতি বা অনুশাসনের সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই তিনটি মূলনীতির স্রষ্টা হচ্ছেন লোৎকা, জিপফ এবং ব্রেডফোর্ড (Lotka, Zipf & Bradford)। বর্তমানে ত্রয়ী সঙ্গমে যে একটি মূলনীতি আমাদের হাতে এলো, তার মাধ্যমে এই বিশ্বের বিরাট বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের ভান্ডারকে বা বিষয়ের জগৎকে বিভাজন করে সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা সহজ হয়ে গেছে।

মেন্ডেলব্রট (Mandelbrot) তাঁর মডেলে বা ছাঁচে ভাষার যে আকৃতি-গত ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন তা জিপ্‌ফ্‌ (Zipf)-এর ভাষা সংক্রান্ত অনুশাসনে শেষ হয়েছে। ফেয়ারদরুন্‌ (Fairthorne) মডেল বা ছাঁচ লোৎকার (Lotka) নীতিকে অনুসরণ করেছে। লোৎকা ব্রেডফোর্ড, জিপ্‌ফ্‌ এবং মেন্ডেলব্রটের (Bradford, Zipf & Mandelbrot) তথ্য বিতরণ নীতিকে গ্রহণ করেও সংখ্যার দিক থেকে লেখকদের সম্পর্কে প্রোফাইল বা রেখাচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একটু নিম্ন স্তরের মূল্য নিরূপণ করে ফেলেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন তাঁর নীতি কার্যে রূপায়িত করেছেন তখন কিন্তু দেখা গেল লেখকদের রেখাচিত্র অঙ্কন করবার সময় কম মূল্য দিলেও তথ্য বিতরণের সময় সঠিকভাবেই লেখকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কয়েলের (Coil) ছাঁচে বা মডেলে দেখতে পাই সংখ্যাতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লোৎকা'র নীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন এবং এটা করতে তিনি কিছু ডাটার সাহায্য নিয়েছেন। ডঃ সেনগুপ্ত আমাদের যে মডেলটি দিয়েছেন তার মধ্যে দেখা যায় যুদ্ধোত্তরকালে বিজ্ঞান বিষয়ে সাময়িক পত্রপত্রিকার গুরুত্ব কতখানি বেড়েছে এবং তা করতে গিয়ে তিনি একটি Weightage Formula আমাদের সামনে রেখেছেন। যাই হোক আরও অনেক তথ্যবিজ্ঞানী সঠিক তথ্য সঠিক ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেবার জন্য এবং তথ্যপঞ্জী পরিমাপ করবার জন্য বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করে তাকে বিশ্লেষণ করে এগিয়ে চলেছেন।

ইদানীংকালে যে ট্রেইন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নথিপত্রাদি (Bibliometric Literature) গ্রন্থ বিজ্ঞানের সমগ্র প্রকাশনার শতকরা পঁচিশ ভাগ দখল করেছে। তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নথিপত্রাদির একটা বিরাট অংশের ভিত্তিভূমি হচ্ছে উল্লেখস্বরূপ নির্দেশকের বিশ্লেষণ (Citation analysis) যা নাকি গ্রন্থপঞ্জী পরিমাপকের গবেষণার ক্ষেত্রে

মুখ্য রূপ (Fact)। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যে কর্মকান্ড ব্রেডফোর্ড (Bradford) তাঁর অনুশাসনের (Law of scattering of scientific papers) মাধ্যমে শুরু করেছিলেন তা আজও পাকাপোক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য স্থলেও যেখানেই গ্রন্থপঞ্জী পরিমাপকের কৌশল প্রয়োগ সম্ভব, সেখানেই সামঞ্জস্যপূর্ণতার সঙ্গে তা হয়ে চলেছে।

(ক) গাবষণার পরিমান নির্ধারণ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন অংশের বিকাশ তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

(খ) মাধ্যমিক সাময়িক পত্রপত্রিকার ব্যাপক মূল্যায়ণ হচ্ছে।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ের নথিপত্রের সঠিক লেখক এবং সঠিক ব্যবহারকারী খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে।

(ঘ) অতীতের এস. ডি. আই. সেবার প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করাও সম্ভব।

(ঙ) তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের যে সব মডেল বর্ত্তমানে রয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নতুন নতুন মডেল (Experimental model) প্রস্তুত করতে হবে এবং তার জন্য নতুন করে তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(চ) বিভিন্ন বিষয়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জার্নালের বা সাময়িক পত্রের সণাক্তকরণ এবং প্রয়োজনভিত্তিক নথিপত্র সংগ্রহ করবার নীতি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে মূল প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ক্ষতি না করে সীমাবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থার অপচয় রোধ করা যায়। এক্ষেত্রেও তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের সাহায্য নিতে হবে।

(ছ) কর্মোপযোগী বহু শাখা বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক পদ্ধতির সূত্রপাত করতে হবে।

(জ) তথ্যের অন্তঃপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং তথ্য সমাযোজন সঠিক সময়ে করতে হবে।

(ঝ) তথ্য সমাযোজন ব্যবস্থা উন্নতমানের করতে হবে এবং এর জন্যই তথ্যপঞ্জী পরিমাপক পদ্ধতির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকেই তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের নথিপত্রাদির প্রকাশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রিচার্ড এবং

উইটিং (Prithard & Witting) ছয়শত নথি লিপিবন্ধ করে একটি বিষয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছিলেন, যাতে ১৮৭৪ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নথি বা ডকুমেণ্ট স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে জেরেপ্প (Hjerppe) এই বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জীটি পুনরায় নতুন করে সংকলন ও প্রকাশ করেন, তখন এর লিপিবন্ধকরণের (Entry) সংখ্যা বেড়ে ২০৩২ হয়ে যায়। ১৯৮২ সালে জেরেপ্প একটি সাপ্লিমেণ্ট বা ক্রোড়পত্র বের করেন, যেখানে অতিরিক্ত ৫১৮টি নথি লিপেবন্ধ হয়েছে।

তাই উপসংহারে বলা যায় জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা যেভাবে দ্রুতগতিতে বিস্তারিত হচ্ছে, তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের গবেষণা ক্রমাগত বেড়ে চলবে এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে তা বিশেষ ভূমিকা নেবে।

References

1. Sengupta, I.N.—Bibliometrics : a birds eye view. IASLIC Bulletin. 30 (4) 1985. 167—174
2. Guha, B.—Documentation and Information : Services. Techniques and systems, 1983.
3. Vickery, B.C.—Bradford's law of scattering. J. Docum. 1948 4 (3), 198—203.
4. Ranganathan, S.R. Librametry and its scope. DRTC Annual seminar, 1969, Vol.—2, 285—300.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তথ্যকেন্দ্রে সিস্টেমস্ এনালিসিস্

সিসটেমস এনালিসিস জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আজ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সিসটেমস এনালিসিসের ব্যাপারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োগ শুরু করা হয়েছিল। তবে সৃষ্টির কাজে নয় যুদ্ধের প্রয়োজনে। এ কথার অর্থ এই যে সামরিক অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে পক্ষপাতিত্বই সিসটেম এনালিসিসের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিষয়টি ছিল সৃজন ধর্মী এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে সুফল পাবার সম্ভাবনা জ্ঞানীগুনীরা অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। এর কারণ, বিষয়টি ছিল সর্বার্থসাধক। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সিসটেমস এনালিসিস বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ একটি প্রচলিত সর্বজন গ্রাহ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হলো।

সিস্টেমস্ এনালিসিসের বিষয় আলোচনা

এখন দেখা যাক, সিসটেমস এনালিসিস বিষয়টি কি? কেমন করে একটি সিসটেমকে বিশ্লেষণ বা এনালিসিস করা যায়? সিসটেমস এনালিসিসের জন্য কি কমপিউটার প্রয়োগ একান্তই আবশ্যক?

এই বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। সিসটেম এনালিসিস বুঝতে গেলে বা এর সংজ্ঞা দিতে গেলে প্রথমে সিসটেম ব্যাপারটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। একজন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করে তার রক্তসংবহন তন্ত্র (Circulatory system) এবং শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর। যেমন মানবদেহের বিশেষ পরিপাক পদ্ধতি নির্ভর করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো হচ্ছে মুখ, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র অন্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র, মলাশয় (colon), হজমীরস নিঃসারক গ্রন্থি ইত্যাদি। সমস্ত অংশগুলো তাদের প্রক্রিয়া একে অপরের উপর নির্ভর করে এমনভাবে চালিয়ে যায় যেন মনে হয় অংকের হিসাব মিলিয়ে তারা কাজ করে চলেছে। এদের যে কোন একটি অংশে গরমিল হলেই মানবদেহের সবলতা বিঘ্নিত হতে পারে। মানবদেহেব উদাহরণ গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সিসটেমস

বা পদ্ধতি হচ্ছে কতকগুলো একত্রভাবে মিলিত অংশ যা একে অপরের উপর নির্ভর করে কোন উদ্দেশ্যলাভের সোপান সৃষ্টি করে।

যে কোন মানুষের সাধারণ শিক্ষা থাকলেই সে অতি সহজেই মানবদেহের পদ্ধতিগত দিক বা যান্ত্রিক দিক, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় human anatomical system এবং mechanical system বুঝতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় যে সব জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে বা বিভিন্ন অংশ যে অবস্থার মধ্যে বিরাজ করে সে ব্যবস্থাকে বোঝা সব সময় সহজ হয় না। সুতরাং যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আজ যে ব্যবস্থা বা সিসটেমস্ আশা করেন, হয়তো আগামী দিনে এ ব্যবস্থা পাল্টাতে চাইতে পারেন। ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর একটি পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হতে পারে। প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, মূল কথা হচ্ছে উন্নততর কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সজীব করে তোলা অর্থাৎ প্রয়োজনে সিসটেমস্ বা পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন।

যদি কোন অজীর্ণ রোগগ্রস্থ মানুষের পরিপাক পদ্ধতি অনুধাবন করা যায়, তাহলে সেই মানুষের পরিপাক পদ্ধতির সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যে অঙ্গটির জন্য তার অজীর্ণতা হচ্ছে সেটি অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রীকরণ করতে হবে। এই স্বতন্ত্রীকরণের কাজটি নির্ভর করে একজন ডাক্তারের দক্ষতার উপর। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় সেখানে সঠিক ওষুধ নির্বাচনের মাধ্যমে ডাক্তার বহু অজীর্ণ রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন। রুগীদের সুস্থ হওয়াটা নির্ভর করে সে কতটা ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত। স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে যে একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে কর্মরত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে প্রয়োজন সাপেক্ষে বর্তমান ব্যবস্থাটি পরিবর্তনে কতটা আগ্রহী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির যে অংশটির জন্য কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে তাকে সংশোধন করতে সেই কর্মীদের সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন।

এবার দেখা যাক, বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কি? একটা সিসটেমকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তার পৃথকভাবে উপাদানগুলো বা অঙ্গীভূত অংশগুলোর গঠন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যপ্রণালী অনুধাবণ করা প্রয়োজন। এই পৃথক পৃথক অনুশীলন প্রক্রিয়াই বিশ্লেষণ।

সিস্টেম এনালিসিসের সংজ্ঞা ঃ

সিসটেম এনালিসিস এর সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনে সিসটেম এর প্রসঙ্গ আসে। সিসটেম বা ব্যবস্থার সংজ্ঞা হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল অংশের একটি সুসংবদ্ধ পূর্ণ সংগঠিত রূপকে সিসটেম বলা যেতে পারে। সিসটেমস্ এনালিসিস হচ্ছে সংগঠিত বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান যার মাধ্যমে একটি ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলোকে বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে সংশ্লেষণের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করে সিসটেমের লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। সিসটেমকে দেহ, সংস্থা, প্রক্রিয়া, যন্ত্র প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মানুষের জীবনে নানা সমস্যা প্রতিনিয়ত দেখা দেয়। সেই সব সমস্যা সমাধানে সিসটেমস বিশ্লেষণের ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা বুঝতে হবে যে দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মানবদেহকে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন। আবার ভিন্ন ধরণের দক্ষতার প্রয়োজনও হয়। এখন দেখা যাক্ কোন প্রতিষ্ঠানের সিসটেমকে কেমন করে বিশ্লেষণ করা যায় বিশেষতঃ এখানে বিবেচ্য বিষয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। একথা যেমন সত্য যে বিশ্লেষককে পারদর্শী হতে হবে বিশেষতঃ যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ করতে তিনি আসবেন। অনেক সংগঠনের কার্যাবলী একই ধরণের হয়ে থাকে। সেই কারণে যে কোন বিশ্লেষক সংগঠনগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

কোন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ থাকে (ক) ক্রয় (খ) উৎপাদন (গ) বিক্রয় ও বাজার (ঘ) কর্মীবৃন্দ ও অর্থ ইত্যাদি। এসকল অংশগুলোর কাজকর্ম সাধারণ পরিচালনের মধ্যে পড়ে। যে কোন দক্ষ বিশ্লেষক উপরিউক্ত অংশগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।

তথ্যকেন্দ্রও একটি কর্মবহুল প্রতিষ্ঠান ঃ

যখন একটি গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখন পাঠকদের এটা বোঝাতে অসুবিধা হয় যে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও নানা সমস্যা রয়েছে। তথ্যকেন্দ্রের কাজই হল তথ্য সরবরাহ

করা। সন্দেহ নেই তথ্যকেন্দ্রের কর্মকান্ড একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্নতর। এখানে সমস্ত কাষ্টমার বা পাঠকদের একই দৃষ্টিতে দেখতে হয়। তথ্যকেন্দ্রের পরিসেবার মূল কথাই হল সমস্ত তথ্য ব্যবহারকারীকে তার প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু দিয়ে সাহায্য করা।

এখন প্রশ্ন হল যে, একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করবার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করতে হয় সেই কৌশলে কোন তথ্যকেন্দ্রের কাজকর্মকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে কিনা; তথ্যকেন্দ্র একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তথ্যকেন্দ্রে সিসটেম এনালিসিসের প্রয়োগ করতে গেলে সেবা'র দৃষ্টিভঙ্গীতেই তথ্যকেন্দ্রে ব্যবস্থার বিশেলষণ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই তথ্যকেন্দ্রে ব্যবস্থা বিশেলষণের মূল লক্ষ্য হল, কেমন করে সেবার পরিধির বিস্তার করা যাবে।

তথ্যকেন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঃ

একটি তথ্যকেন্দ্রের জন্য মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হচ্ছে—বই, সাময়িক পত্রপত্রিকা রাখার জায়গা ইত্যাদি।
প্রকাশিত গ্রন্হাদি সংগ্রহ করবার এবং সেগুলো যথাস্থানে সংরক্ষণ করা একটি প্রধান কাজ। এরপর সেগুলো ব্যবহারযোগ্য করবার জন্য বর্গীকরণ, সূচীকরণ, নির্দ্দেশক প্রস্তুত করে সংগঠিত করতে হবে।

তথ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশগুলো বোঝাবার জন্য একটি নকশার সাহায্য নেওয়া গেল।

তথ্যকেন্দ্রের কর্মপদ্ধতি

সদস্যদের নাম নথিভুক্তকরণ—নথি নির্বাচন—নথি সংগ্রহ—বর্গীকরণ
এবং নবীকরণ। ↓
সূচীকরণ
↓
প্রকাশন←—নথি রাখবার জায়গা←—সংগঠিত করণ←—নির্দ্দেশক প্রস্তুত
↓
প্রচার——→নথি লেনদেন——অন্যান্য সহযোগী কর্ম।

এখানে বলা বাঞ্ছনীয় যে অনেক তথ্যকেন্দ্রে অনুবাদ, রেপোগ্রাফী, কম্পিউটার সার্ভিস ইত্যাদি দেখা যায় না। উপরের নক্সা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, অনেকগুলো কাজ গ্রন্হাগারিক সম্পাদন করেন। অনেক সময় যে জিনিষটি ভুলে যাওয়া হয় তাহলে যদি কোন ব্যবহারকারী না থাকে,

সে তথ্যকেন্দ্রে যত নথি থাকুক না কেন তা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কিছু তথ্য কেন্দ্রে মঞ্চে নথি সাজিয়ে কিছু লোক আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু একটি শাড়ীর দোকানে শাড়ীগুলো শোরুমে সাজিয়ে রেখে দোকানী কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? এভাবে রঙ্গনাথনের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে তথ্যকেন্দ্রের ব্যবহারকারী তথ্যকেন্দ্রের সার্থকতা নিয়ে আসে।

তথ্যকেন্দ্রে নথি ব্যবহারকে যদি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের নিকট পেঁছে দিতে হয় তবে, সিস্টেমস এনালিসিস করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার হোক বা না হোক সিস্টেমস এনালিসিস করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। বড় তথ্যকেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে সিস্টেমস এনালিসিস না করলে বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। সিস্টেমস এনালিসিসের অপর নাম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক চিন্তার মাধ্যমে যদি কোন সংস্থানকে পরিচালনা করতে হয়, তবে সিসটেমস এনালিসিস অপরিহার্য। যখন গ্রন্থাগার পরিসেবার কোন অসুবিধা দেখা দেবে, তখনই বোঝা যাবে গ্রন্থাগারের কোন অংশে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় সিসটেমস এনালিসিস করে যে অংশে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর সমস্যাটি সমাধান করতে হবে।

তথ্যকেন্দ্রে সিস্টেমস এনালিসিসের পরীক্ষা নিরীক্ষা কেমন করে সম্ভব?

সিসটেমস এনালিসিসের প্রাথমিক পর্যায় যদি কোন তথ্যকেন্দ্রে সিসটেমসের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, তবে প্রথমেই বুঝতে হবে তথ্যকেন্দ্রটি কোন লক্ষ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রটি জাতীয় তথ্যকেন্দ্র হতে পারে, সাধারণ তথ্যকেন্দ্র হতে পারে অথবা বিশেষ তথ্যকেন্দ্র হতে পারে। তথ্য কেন্দ্রটির সমাজ জীবনে ভূমিকা জানা হয়ে গেলে সিসটেমস এনালিষ্ট তার সমস্ত বিভাগগুলো বা অংশগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করতে পারেন। অর্থাৎ তথ্য কেন্দ্রটির প্রতিটি অংশের কাজগুলো অনুধাবন করতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই একটি তথ্যকেন্দ্রের কাজকর্ম থেকে একটি মাঝামাঝি বা ছোট তথ্যকেন্দ্রের কাজকর্ম ভিন্নতর হবে এবং সেইজন্য সিসটেমস এনালিসিসের প্রয়োগ ও প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের হবে। সুতরাং প্রথম স্তরে তথ্যকেন্দ্রের ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সিসটেমস এনালিসিসের

কাজ শুরু করতে হবে। একথা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্কার হয়েছে সিসটেমস এনালিসিসের মাধ্যমে কোন নতুন তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় না, বরং এর মাধ্যমে কোন নতুন তথ্যকেন্দ্র উন্নত পর্যায়ে উঠতে পারে। সিসটেমসের পরীক্ষা নিরীক্ষা একটি তথ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশের বা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে এবং সংগঠনের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করা হয়।

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কি ?

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ হচ্ছে কোন সংগঠনের বিভিন্ন অংশের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যগুলো টেনে বার করে নিয়ে আসা। পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের (Background Analysis) উপর সিসটেমস বিশ্লেষককে অনেকটা নির্ভর করতে হয় অথবা বাইরের কোন বিশেষজ্ঞ বা কোন তথ্য-কেন্দ্রের কর্মীর উপর নির্ভর করে সিসটেমস এনালিসিস চলতে পারে। সিসটেম বিশ্লেষককে বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণের কাজকে এগিয়ে নিতে হয়। তাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের এবং ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়। যে পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষককে প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো হচ্ছে :—(ক) সংগঠনের চার্ট পরীক্ষা, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং কাজের মেনুয়েলটি (Mannual) অবলোকন করে নেওয়া।

(খ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে সমীক্ষা করা একান্ত দরকার।

(গ) ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, এবং

(ঘ) তথ্যকেন্দ্রটির বিভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টগুলোতে গিয়ে সিসটেমস বিশ্লেষককে সাক্ষাতকার নিতে হবে।

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কি ?

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিসটেমস বিশ্লেষক (Analyst) তথ্যকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। তাকে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো পর্যালোচনা করতে হয়।

(ক) **বর্ত্তমান অবস্থার সুস্পষ্ট ছাপ** :—প্রতিষ্ঠানের চার্ট মেনুয়েলের মাধ্যমে সাংগঠনিক চেহারাটি ভাল করে বুঝে নেওয়া।

(খ) **বহিঃ আদিক অবস্থা** :—যখন বিশ্লেষক একটি সিসটেমসের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন তখন তার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি বা তথ্যকেন্দ্রটির সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

(গ) **অনুমিত অবস্থা ঃ** প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিসটেমস এনালিষ্ট বা বিশ্লেষক এই প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারেন এবং কোন ধরণের কর্মচারীর উপর কি ধরণের কাজ দেওয়া আছে তাও জানতে সক্ষম হন।

(ঘ) **প্রয়োজনীয় অবস্থার কল্পনা ঃ**—বিশ্লেষক অনুভব করবেন কেমন করে? বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভবিষ্যত অবস্থার রূপরেখা প্রস্তুত করা যায় এবং সেই সংগে বর্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করা যায়।

এখন একটি তথ্যকেন্দ্রকে কল্পনা করা যাক। তথ্য কেন্দ্রটিতে পুরনো কিছু আসবাব আছে এবং সেগুলো একটি জীর্ণদশা ভবনে রক্ষিত আছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, তথ্যকেন্দ্রের ভবনটিরও অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে তথ্য কেন্দ্রটির পরিবেশের কথা কল্পনা করতে হবে। একজন সিসটেমস বিশ্লেষকের প্রথম কাজই হচ্ছে তথ্য কেন্দ্রের ভবনের মধ্যে পায়চারী করে ঘুরে ঘুরে দেখে নেওয়া যে, এখানে কেমনভাবে কাজকর্ম চলছে। বিশ্লেষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, ভাল করে দেখে নেওয়া কয়টি ধাপের মধ্যে দিয়ে এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এখানকার কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। এভাবে বিশ্লেষক পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের (Background analysis) মধ্য দিয়ে তথ্য কেন্দ্রটির একটি ছবি পেয়ে যাবেন। একটি কথা না বললেই নয় যে পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচারীরা তাদের কাজের ধারা শুরু করেন।

এমনও দেখা যায় যে বিষয় নির্দ্দেশকের কাজগুলো ভাঙ্গা বাঁকা কাঠের ড্রয়ারের মধ্যে থাকে এবং অনেক সময় কার্ডের উপর জল পড়ে লেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। অথবা হয়তো দেখা যায়, এমন কিছু মূল্যবান সাময়িক পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে আসে যার হদিশ পাঠকেরা পায় না। আরো দেখা যায় যে অনেকে সভ্যপদ বাবদ চাঁদা যথাসময়ে দেবার ব্যাপারটাও খেয়াল রাখেন না। অনেক সভ্যরা ঠিক সময়ে তাদের বইপত্র ফেরত দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এগুলো উদাহরণ হিসাবে দেখানো হল যার উন্নতিবিধান করাটা অসম্ভব নয়। এসকল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে গেলে সিসটেম এনালিষ্ট বা বিশ্লেষকের সাহায্য অবশ্য নিতে হবে। পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিসটেম এনালিষ্ট সিসটেম এনালিসিস করে যে সমস্ত কারণে উপরোক্ত অসুবিধাগুলো তথ্যকেন্দ্রে হচ্ছে সেগুলো দূর করতে সক্ষম হবেন এবং তথ্য কেন্দ্রটিতে একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারেন।

সিস্টেম এনালিসিসে কম্পিউটারের প্রয়োজন আছে কি ?

পূর্বেই বলা হয়েছে কম্পিউটার তথ্যকেন্দ্রে প্রয়োগ হোক বা না হোক সিসটেম এনালিসিস সবসময়েই তথ্যকেন্দ্র পরিচালনায় টুল (Tool) হিসাবে কাজ করতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক তথ্যবিজ্ঞানীকে ক্ষোভের সঙ্গে বলতে শোনা যায় যে কি হবে সিসটেম এনালিসিস করে, কারণ এখানে অন লাইন (on line) সার্ভিস নেই যা উন্নত দেশের তথ্যকেন্দ্রে রয়েছে। আরো শোনা যায় যে বর্তমানে অধিকাংশ তথ্যকেন্দ্রে সার্ভিসের মান অত্যন্ত নেমে গেছে। নথি সঠিক জায়গায় পাওয়া যায় না, ব্যবহারকারীরা তথ্যকেন্দ্র এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে একথা বলা যায় যে কম্পিউটারের প্রয়োগ বৃহৎ তথ্যকেন্দ্রে চলতে পারে। ছোট তথ্যকেন্দ্রে যদি সিসটেমস এনালিসিসের সাহায্য নেওয়া যায় তবে কম্পিউটার ছাড়াও সার্ভিসের উন্নতিবিধান সম্ভব। তথ্যকেন্দ্রের উন্নতির ব্যাপারে প্রথমেই দেখতে হবে যে সেখানে প্রয়োজনীয় সার্ভিসের উপযোগী সাজসরঞ্জাম রয়েছে কিনা। যদি তা না থাকে তবে শুধু মাত্র কম্পিউটার প্রয়োগ হচ্ছে না বলে কাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় বলা সমীচীন নয়। আর একটি কথা বলা ভালো যে আজকের তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থায় সিসটেমস এনালিসিস অপরিহার্য।

সর্বশেষ মনে রাখতে হবে যে কম্পিউটার কোন তথ্যকেন্দ্রে প্রয়োগ করতে হলে সিসটেমস বিশ্লেষককে যেমন একটি Flow chart প্রস্তুত করতে হবে তেমনি কম্পিউটার প্রয়োগ না করলেও সিসটেমস এনালিসিসের জন্য Flow chart আবশ্যক। Flow chart এর মধ্য দিয়ে যে কোন সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলীর ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তাহলে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল কম্পিউটারের প্রয়োগ হলে সিসটেমস এনালিসিস তথ্য কেন্দ্রে যতটা প্রয়োজন কম্পিউটার প্রয়োগ না হলেও তথ্যকেন্দ্রে সিসটেমস এনালিসিস ততটাই প্রয়োজন।

References

1. Bingham, I. E. & Davies G.—Handbook of System analysis. 1978.

2. Chapman, E. A.—Library system analysis guide lines 1970.
3. Condone, R. J.—Data processing system analysis & design. 1978.
4. Foskett, D. J. ed.—Library system and information : proceeding of the second Anglo-Czech conference of information specialists. 1970.
5. Meadow, Charles, T.—The Analysis of information system. 1973.
6. Moore, Z.—System analysis : an overview (Special Lib. 58, Feb. 1967).
7. Orr, R. H.—Development of methodlogic tools for planning and managing library services (Bulletin of the Medical Lib. Association, 56, 1968 ; July, 241—67).
8. Salmon, S. R., ed—Library automation : a state of the art review, 1967.
9. Thiagarajan, R.—Systems. Analysis in the Library, 1982 (In workshop of computer techniques in information processing : March 3—8, 1980 Dept. of Lib. Sc. Delhi University).
10. Ray, D. K.—System Analysis in information centres (In Granthagar, Vol 36, nos. 9—10, 1987).

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তথ্য বিজ্ঞানে মান নির্ণয়ের ভূমিকা

তথ্যবিজ্ঞানীমাত্রই তথ্যপ্রবাহ এবং তার গতিপ্রকৃতির নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মান বজায় রাখবার চেষ্টা করে থাকেন। ইংরাজীতে একে বলে Standard, আর বাংলায় মান নির্ধারিক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। একটি কথা বলা প্রয়োজন, কোন কোন তথ্যবিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়াকে মানক আখ্যা দিয়েছেন। এটা কারো অজানা নয় যে শিল্পোদ্যোগে এবং উৎপন্ন দ্রব্যে মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার প্রভাব খুব বেশী। তথ্য বিজ্ঞানে মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার সার্থক প্রয়োগ দেখা দেয়।

তথ্যকেন্দ্র ভবনের আকৃতি, আসবাবপত্র, আলোর ব্যবস্থা অথবা তথ্য-পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হলে মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এগুলো মানানুষায়ী না হলে তথ্য পরিসেবার কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য। তথ্যকেন্দ্রের কোথায় কোন বিভাগ হওয়া উচিত তার নির্দ্দেশ মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে। অনেক সময় দেখা যায়, মাননির্ণয় প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত অনুমোদনকে মূল্য না দিয়ে তথ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে কিছু কিছু কার্যপ্রণালী চলে আসছে। তবে সেগুলো যদি কাজ সহজতর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয় তবে তাকেও স্বীকার করে নিয়ে মান নির্ণয় প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা ভাল। পৃথিবীতে প্রায় সর্বদেশেই একই আকারে সূচীকরণের নিমিত্ত কার্ডের ব্যবহার দেখা যায়। তাই এটি মান নির্ণয় প্রক্রিয়া, স্থান, অনুশাসনগুলোর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাদের উপযোগী মান নির্ণয় প্রক্রিয়ায় কাজ চলে থাকে। একটি কথা আমরা সকলেই জানি পৃথিবীর সর্বদেশেই মান নির্ণয় স্থিরীকরণের জন্য এক একটি জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একদিকে (ক) স্বীকৃত সংস্থা কর্ত্তৃক অনুমোদিত মান নির্ণয় প্রক্রিয়া, (খ) অন্যদিকে বহুদিনের অভ্যাস ও কর্মপ্রণালীর ফসল হিসাবে স্বীকৃত মান নির্ধারণ।

মান নির্ণয়ের সংজ্ঞা—আমাদের কাজ তথ্য নিয়ে। সুতরাং Encyclopaedia of Library and Information Science যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাকেই ধ্রুবতারা করে আমাদের অনুসরণ করা উচিত। তথ্যবিজ্ঞানী ডঃ অজয় চক্রবর্তী মহাশয়ও উপরোক্ত কোষগ্রন্থকে অনুসরণ করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে মান নির্ণায়ক হচ্ছে এক ধরণের পদ্ধতি যার সাহায্যে তথ্য পরিসেবার মূল্যায়ণ ও পরিমাপ করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে কোন তথ্যমূলক কাজের পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মাননির্ণয়করণ পদ্ধতির দ্বারা করতে হবে।

মান নির্ণয়ের ক্ষেত্র—তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মান নির্ণয় করবার প্রয়োজন সমধিক। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন হলেও পৃথিবীতে সভ্য ভাবে বাঁচতে গেলে প্রতিটি বিষয়ে মান নির্ধারণ করে চলাই বাঞ্ছনীয়। তা নাহলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

আমরা এখন আলোচনা করব ঃ—(ক) তথ্যকেন্দ্র সংক্রান্ত (খ) তথ্য বিজ্ঞান ও নথি সংক্রান্ত (গ) রেপ্রোগ্রাফী ও কমপিউটার সংক্রান্ত (ঘ) পরিভাষা সংক্রান্ত ইত্যাদি।

(ক) **তথ্যকেন্দ্র সংক্রান্ত**—তথ্যকেন্দ্রের ভবন, আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি তো করতেই হবে, সেই সঙ্গে বর্গীকরণ, সূচীকরণ, নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ প্রভৃতি অনেকগুলি মানের উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোন বিশেষ মান নির্ণয় পদ্ধতি অনুসরণ না করেই দেশে বিদেশে নিজ নিজ নিয়ম অনুযায়ী এতকাল চলেছিল এবং আজ সেই সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত মাননির্ণায়ক প্রক্রিয়া স্বীকৃত মান নির্ণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে পড়েছে।

(খ) তথ্য-বিজ্ঞান ও নথি সংক্রান্ত—একথা আজ আর অজানা নেই যে তথ্যবিজ্ঞানে মাননির্ণায়ক প্রক্রিয়া বেড়ে চলেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ISO নানাপ্রকারের মাননির্ণায়ক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। নথির আকৃতিগত, অংশগত এবং কাঠামোগত নানাপ্রকার Specification ISO দিয়েছে। এছাড়া বস্তুসংক্ষেপ, পরিধি ও অনুবাদের নিয়ম এবং বর্ণান্তরের নিয়ম সবকিছুরই নির্দেশ মাননির্ণয় প্রক্রিয়ার

মধ্যে পড়ে। ISO বই, সাময়িক পত্রের কাঠামো, সূচীপত্র, সাময়িকপত্রের শিরোনামের সংক্ষেপরূপ ইত্যাদি সবকিছুর মান নির্ধারণ করেছে।

(গ) **রেপ্রোগ্রাফী ও কমপিউটার**—আধুনিক যুগে ডকুমেন্টারী রিপ্রোডাকশন ও যান্ত্রিকভাবে তথ্য উদ্ধার সভ্যজগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা, এর ফলে রেপ্রোগ্রাফীর কলা-কৌশল ও কমপিউটারের প্রয়োগ কৌশল দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এর জন্য বিশেষভাবে কতগুলো মাননির্ণায়ক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। যাকে ডঃ চক্রবর্ত্তীর মতে মানকের প্রয়োগকৌশল বলা যায়। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মান নির্ণায়ক প্রয়োগ কৌশল গড়ে উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—মাইক্রোফিল্ম রাখার ব্যবস্থা, মাইক্রোফিল্ম পড়ার যন্ত্র, ফটোকপির আকার। ফ্লোচার্ট সংক্রান্ত সংকেত, ডিজিটাল কমপিউটারের ধারা, তথ্যপরিবেশনের জন্য record format প্রস্তুত ইত্যাদি।

(ঘ) **পরিভাষা সংক্রান্ত**—ইংরাজীতে আমরা যাকে টারমিনলজী (Terminology) বলে থাকি, তাকে এখানে পরিভাষা বলছি। তথ্য বিজ্ঞানের গতি এবং প্রবাহ প্রচন্ডভাবে বেড়ে চলেছে। মাতৃভাষায় তথ্য বিজ্ঞানের পঠন পাঠন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এই মুহূর্তে যদি আমরা পরিভাষার উন্নতি বিধান না করি তবে অদূর ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তবে পরিভাষার অপেক্ষায় বসে না থেকে যে সমস্ত কথা আমরা ইংরাজীতে বলতে এবং বুঝতে অভ্যস্ত সেগুলো মাতৃভাষায় ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। আর এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মেই (Natural course) বহু ভাষার সংমিশ্রণে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন শব্দের সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগ মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কোন কোন শব্দ কোথায় কোথায় সঠিক প্রয়োগ করতে হবে তা মাননির্ণয় প্রক্রিয়া দ্বারাই সম্ভব।

সর্বশেষে কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ করব, যারা এই মান নির্ধারণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যেগুলোকে ইংরজীতে বলা যায় Standarisation Organisation বাংলায়, মাননির্ণায়ক সংস্থা। (ক) আন্তর্জাতিক মাননির্ণায়ক সংস্থা (International Standards Organisation বা ISO) (খ) আমেরিকান সংস্থা (American Society for testing and materials—ASTM) এবং American Standards Committe (গ) ব্রিটিশ সংস্থা (British Standards Institution BSI)। UDC বর্গীকরণের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই সংস্থা

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। (ঘ) ভারতীয় মানক সংস্থার (Indian Standards Institution) ভূমিকাও উজ্জ্বল।

এই সংস্থাটি তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কয়েকটি মান নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো।

IS : 382—1952 Practice for Alphabetical arrangement.

IS : 790—1956 General Structure of Preliminary page of a book.

IS : 791—1956 Half Title leaf of a book.

IS : 794—1956 Practice for table of contents.

IS : 1064—1961 Paper sizes.

IS : 4—1963 Guide for layout of learned periodicals.

IS : 795—1966 Cannons for making abstracts.

IS : 796—1966 Glossary for cataloguing.

IS : 3083—1966 Processing of Microfilms.

IS : 1358—1967 Practice for layont of library catalogue code.

IS : 1275—1976 Rules for making alphabetical Indexes.

IS : 2381—1978 Recommendations fot bibliographical references.

IS : 9450—1980 Guidelines for placement of images in roll microfilm.

IS : 9637—1980 Guide lines for presentation of information in technical mannual.

সর্বশেষে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে সর্বক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের কাজের মধ্যে মাননির্ণায়ক প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করি তবে সমস্ত কাজের একটা সামঞ্জস্য আসবে তাতে কাজের গতি বাড়বে এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

References

1. Cuha, B.—Documentation and Information, 2nd. 1983.
2. Rajan, T. N. Ramaswami, K.—International Standards Book Number. A Lib. Sc. Do. 1972 19 (i) (25—29).
3. Encyclopaedia of Library and Information science, ed. by A. Kent & ors. Vol II.
4. Chakraborty, A. R.—Tathya Bigganer Ruprekha. 1968.

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য স্থানান্তরণ

ভূমিকাঃ স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম যোগাযোগকারী উপগ্রহের মারফৎ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া আজ আর অলীক স্বপ্ন নয়। এটি আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের এক অমোঘ বিধান। যাকে আমরা বলে থাকি বাস্তব ঘটনা। তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে কতগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমধর্মী প্রযুক্তিবিদ্যার আগমনের ফলে। বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে বিশেষ যে তিনটির নাম করতে হয়, সেগুলো হল ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা, পরিগণক এবং যোগাযোগ রক্ষা কল্পে সৃষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যা। বিশেষতঃ পরিগণক বা কমপিউটিং বিদ্যা এবং যোগাযোগ বা কমিউনিকেসন বিদ্যা, তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নিকট নিয়ে এসেছে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা। আর এ সম্ভাবনাকে প্রতিদিন সমৃদ্ধ করবার জন্য তথ্যবিদরা বা তথ্যকর্মীরা কাজে লাগাচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে।

কমপিউটার বা গণক চালু হবার সময় থেকে এবং পরিগণক এবং যোগাযোগ বিজ্ঞান পরস্পর মিশে যাওয়ার ফলে শুধু যে গণক বা কমপিউটার ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে তথ্য পরিসেবার কাজ বিজ্ঞান সম্মতভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে। কমপিউটার বা গণকশাস্ত্রে নেটওয়ার্ক বা জালবিস্তারের সম্ভাবনা হয়েছে উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যার মিশ্রণের ফলে। আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে সর্বকাজে উদীয়মান বিস্তারিত কমপিউটার পদ্ধতির প্রয়োগ। তথ্য প্রযুক্তিবিস্তার বা তথ্যবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় কমপিউটার প্রয়োগ প্রচন্ড সাফল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তথ্যবিজ্ঞানীরা কমপিউটার আয়ত্ব করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এখন দেখা যাক কেমন করে বিচিত্রধরণের নথি তথ্য-প্রবাহের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে।

নথি সরবরাহের বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমঃ আজ বেতার তরঙ্গদ্বারা প্রবাহিত তথ্য নথি রূপে গ্রহণ বহুমানুষের কাছে একটা সাধারণ

ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনলাইন গ্রন্থপঞ্জী উদ্ধারের কাজ এজাতীয় প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন ধরণের গবেষণার মাধ্যম সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তথ্য পরিসেবার কাজকে আরো কতটা উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে সুসংবদ্ধ গবেষণা করার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে বৈচিত্রপূর্ণ তথ্য পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে।

আজ যাঁরা টেলিভিসন বা দূরদর্শন দেখেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন কেমন করে সোভিয়েট রাশিয়া বা আমেরিকার বহু খেলাধূলা এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে।

পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বিচিত্র ধরণের **multimedia document** বা বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্যনথির রূপ নিয়ে স্থানান্তরের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করে চলেছে এবং আমরাও তথ্য গ্রহণ করে চলেছি। এরজন্য প্রয়োজন হচ্ছে নূতন ধরণের টারমিনাল (**Terminal**) বা নূতন ধরণের প্রান্তিক স্টেশন। যাই হোক এভাবে আমরা নূতন নূতন তথ্য আমদানী করে তা যথাযথভাবে বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মধ্যে এবং স্তরের মধ্যে দিয়ে তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে পেঁছে দেব।

নিম্নে আমরা প্রধান কয়েকটি তথ্য প্রসারের দিক উল্লেখ করছি, সেগুলো হচ্ছে—

(১) **বাচন ভঙ্গি**
(২) **লিখন**
(৩) **মুদ্রণ**
(৪) **ডিজিটেল কমপিউটার** বা ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার প্রয়োগ।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণাত্মক শব্দ ও সংখ্যাগুলোতে এমন কিছু জিনিষ প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে **সম** বা **সদৃশ** ব্যবধান বিশিষ্ট রাশিসমূহ বা স্পষ্ট না হলেও কতকগুলো অন্তর্নিহিত শব্দকে পেয়ে থাকি এবং এগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নানা ধরণের ঝোক বা প্রবণতা। প্রথমতঃ যেভাবে আমরা এখন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চলেছি তাতে তথ্যের প্রাচুর্যের বিকাশকে সংহত করা সম্ভব। আসলে প্রত্যেকটি তথ্যের নথি-ভুক্তিকরণের মধ্যে আমরা তথ্যের গভীরতর প্রদেশে পেঁছবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয়ত এক একটি স্তরে যদি আমরা অবলোকন করি,

তবে দেখতে পাবো প্রত্যেকটি স্তরের ব্যাপ্তি ঘটছে এবং সেই সঙ্গে তথ্য চয়ণের প্রবণতা কমে যেতে পারে না।

লেখনী ও মুদ্রণই হচ্ছে প্রথম তথ্য সংগ্রহণ এবং প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ। যদিও গুটেনবার্গের সময় থেকে পাঁচশ বছর ধরে আমরা দেখতে পেলাম নানা ধরণের নানা সংখ্যার তথ্যভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যার আবির্ভাব ঘটছে যেমন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফটোকপি করার যন্ত্র এবং বর্তমানে দেখছি ডিজিটাল কম্পিউটারের অগ্রগতি। অবশ্য এটাই হচ্ছে উপরিউক্ত তথ্যব্যবস্থার সর্বশেষ স্তর। কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যখন ০ থেকে ৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা যুক্ত হয়, তখন তা হয় একটি বহুবিধ তথ্য আহরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রামান্য তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়া। এটি অত্যন্ত প্রামাণ্য হয়ে ওঠে এজন্য যে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয় ০ থেকে ৯ পর্যন্ত আংকিক সংখ্যার দ্বারা। ফলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

তথ্যের গতি আমরা যেভাবে পরিবর্ত্তন করি, তা হচ্ছে—নম্বর, পাঠ্যবই, চিত্রলিখন সংক্রান্ত বা নক্সা প্রস্তুতকরণ, সঙ্গীত, আওয়াজ, শব্দ, প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি।

আকৃতিগতভাবে ডিজিটাল (**Digital**) ধরণের ডাটা (**Data**) গুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে ধরে রাখা সহজ এবং ওগুলি অতি সহজেই প্রেরণসাধ্য। এসব কাজের মধ্যে পাঠ্যবিষয় (**Text**), শব্দ এবং ছবি ইত্যাদির সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। এইভাবে এসব বিষয়ের সম্পাদনা, নিপুণভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরস্পর বিষয়কে সংযুক্ত করার যে সব জটীল পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর সমতা রেখে কম্পিউটারের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার সম্ভব।

ঐতিহ্যগতভাবে মুদ্রিত প্রতিলিপির ব্যবহার শব্দের ক্ষেত্রে এবং ছবির ক্ষেত্রে সুসংহতভাবে নথিতে হয়ে থাকে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এখন তফাৎটা কোথায়? এর উত্তর সহজেই পাওয়া যায় যখন দেখি প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তারিত ডাটা (**data**) গুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে নথি আকারে দ্রুতরূপে প্রসারিত করা যাচ্ছে এবং এইভাবে এটা বিভিন্ন শব্দকেও সহজে প্রেরণ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং আরেকটু বেশীভাবে বললে দেখা যায় দৃষ্টিলব্ধ উপাদানগুলো দ্রুতগতিতে আমাদের কাছে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করে চলেছে এই কম্পিউটার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমের (**multitype or Multimedia**) বা বিভিন্নভাবে তথ্য সুসংবদ্ধভাবে নিগমবদ্ধ হয়ে এককভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্থান করে নিচ্ছে এবং তা যথাস্থানে প্রেরণ করছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে, গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা কোন স্তরে পেঁছিতে পেরেছি ? প্রাথমিক পর্য্যায়ে আমরা দেখলাম পাবলিক সুইচ্‌ট টেলিফোন নেটওয়ার্ক [**Public Switched Telephone network (PSTN)**] এবং প্যাকেট ডাটা নেটওয়ার্কস্ (**Packet Data Networks**) যা নথি উদ্ধারে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই যে প্রাথমিক স্তরের তথ্যের নেটওয়ার্ক আমরা দেখলাম তা মূলতঃ কন্ঠস্বর স্থানান্তরের বা প্রেরণের ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গেলেও, কম্পিউটার বা ডাটা পদ্ধতির মৌলিক প্রয়োজনীয়তা **PSTN** অপেক্ষা বেড়েই যেতে থাকল। এভাবে আমরা **PSTN** বা পাবলিক সুইচ্‌ট্ টেলিফোন নেটওয়ার্ক বৈশিষ্টের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। এতে ভুলের মাত্রাধিক্য দেখতে পেলাম যখন বিভিন্ন ধরণের নথি স্থানান্তরের কর্মকৌশলকে এই পদ্ধতির মধ্যে রূপ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল অভিজ্ঞতার আলোকে প্যাকেট সুইচ্‌ট ডাটা নেটওয়ার্ক (**Packet Switched Data Network**) প্রয়োগকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে **PSTN** গতির দিক থেকে ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়ছে।

সুতরাং নথি প্রেরণের সমস্যা ক্রমাগত ব্যাপ্তি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নানা পরীক্ষা নীরীক্ষা চালাতে হয়েছে, যাতে করে সমগ্র বিশ্বে নথিপত্র ছড়িয়ে দেওয়া বা দেবার কয়েকটি প্রকল্প আমরা প্রস্তুত করতে পারি। এ থেকে জন্ম নিল একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ পদ্ধতির নেটওয়ার্ক বা জাল।

তথ্য স্থানান্তরীকরণের বিশ্বপ্রকল্প বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় টেলিফোনের ও কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রেরণের কাজকে সহজতর করবার জন্য একটি কনসরটিয়াম (**Consortium**) বা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক তৈয়ারী করবার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, যাদের মধ্যে আছে বৃটিশ সরকার। শিল্পসংস্থা এবং সম্মিলিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়। অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে আরো দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ টেলিকম (**B T**),

জি. ই. সি. মার্কণী গবেষণা (GEC Marconi Research), লজিকা লিমিটেড (**Logic Ltd.**), রথফোর্ড এপেলটন লেবরেটরিস [Ruthford and Appleton Laboratories (RAL)], কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় [Cambridge University (CAMB)], লঙবুরো প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (Longborough University of Technology (LUT)] এবং সর্বশেষে ইউ. সি. এল. (**U.C.L.**) প্রভৃতি।

উপরে যে নেটওয়ার্ক (**Network**) এর কথা উল্লেখ করেছি, তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আজ বেড়ে গেছে, সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে নূতন নূতন তথ্যের নেটওয়ার্ক (**Network**)।

এগুলো হচ্ছে—(ক) কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা।
(খ) স্থানীয় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।
(গ) উচ্চশক্তি সম্পন্ন পার্থিব যোগসূত্র বা লিংক্স্।
(ঘ) নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন।

আজকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা। ছয়টি স্থান জুড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত অবস্থান স্থল (Station)। এরা দুভাবে ইউরোপীয়ান স্পেস্এজেন্সির অরবিটেলকে কৃত্রিম উপগ্রহ (**European Space Ageney's Orbital test Satellite or OTS**) যার ভূপ্রকৃতি গত অবস্থানের অক্ষিকোটর আফ্রিকার ভূ-বিষুবরেখা ৩৬,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। এই লিংকের ডাটা পাঠাবার গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক মিলিয়ান বিট।

কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের তথ্য পরিবহন ব্যবস্থা। স্থানীয় ভাবেও কখনও কখনও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আজ আর অবিদিত নয়। একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এই র-ডাটা (**Raw Data**) কথাটি আমরা ব্যবহার করি কারণ, শব্দের প্রকৃত অর্থ এগুলোতে দেখা যায়। বিশ্বে ধাপে ধাপে বড় বড় নথি উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্ম হচ্ছে। ডাটা প্রবাহের গতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে কমপিউটারের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে কমপিউটার। একথা দৃঢ়ভাবে বলা উচিত যে,

টারমিনাল থেকে টারমিনাল, সময়ের হিসাবে আরোপ করা সম্ভব নয়। এ ধরণের যোগাযোগে অনেক সময় ডাটার গতি কমে যায়। ফান্টার বা বাফারিং কণ্ট্রোল (**Buffering control**) ও চাহিদা এর জন্য দায়ী।

একথা আমরা জানি ছয়টি স্হান পৃথিবীতে নির্বাচিত হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের ঘাটি নির্মাণের জন্য।

সর্বশেষে বলা যায় সফটওয়ার (**Software**) ও নেটওয়ার্ক এমনভাবে কাজ করে থাকে যখন অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্হা সম্ভব হয় না, তখন পৃথিবী সমস্ত দিকের টারমিনাল (**Earth Terminal**) $\mathbf{x}^{25}$ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটা তখনই সারক (**Sercs**) ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক—সারক্ নেটওয়ার্ক অথবা $\mathbf{x}^{25}$ নেটওয়ার্ক হবে অথবা **British Telcom's PSS** হবে। প্রথম থেকে দেখা যাচ্ছে আরম্ভে পৃথিবী নানা সমস্যা নিয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে চলেছে, কতকগুলি অংশ নিয়ে এক **Co-herent Systen** গড়ে উঠেছে।

একথা সহজেই বলা যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার সুফল আমাদের উপর পড়তে শুরু করেছে।

বিশ্বের প্রকল্পগুলো আজ কাজ করে চলেছে কতকগুলো নথির মাধ্যমে। বর্তমানে কম্পিউটার এমন সব তথ্য সরবরাহ করছে, যা মানুষের সাধ্যাতীত ছিল।

References

1. **Winfield, Document transfer by Satellite (in ASLIB Proceedings, vol, 36, No, 4. 1984)**
2. **Weitzman, C—Distributed Micro-Minicomputer systems 1980. Englewood cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1980.**

ষোড়শ অধ্যায়

তথ্য পরিসেবায় রেপোগ্রাফী একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে কোন পত্রিকায় বিশেষ কোন খবর প্রকাশিত হলে, যে তথ্যটি হয়তো নিকটবর্ত্তী কোন তথ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে সেই তথ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকেই বলা যায় নথি **Delivery** ব্যবস্থা। এ জাতীয় তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে সংক্ষিপ্তভাবে তথ্য পৌঁছে দেবার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে রেপ্রোগ্রাফী (**Reprography**) পদ্ধতি বা পরিপূরক সেবা (**Back up Service**)।

আমরা জানি ছাপাখানা আবিষ্কৃত হবার পর জ্ঞান বিজ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মুদ্রিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা এমনভাবে বাড়তে আরম্ভ করল যাতে তথ্য বিস্ফোরণের সমস্যা দেখা দিল। এও দেখলাম **CAS** ও **SDO** সেবার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক তথ্যের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বার করে পাঠকের হাতে দেবার ব্যবস্থা করা হল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন লেখার অংশ বা অংশ বিশেষ কপি করে দেবার ব্যবস্থারও সূচনা এখন থেকে হল। এই ব্যবস্থার নামই রেপ্রোগ্রাফী।

এখন দেখা যাক কেমন করে রেপ্রোগ্রাফী (**Reprography**) কথাটির জন্ম হল। **Reproduction** ও **Photography** এই দুটি শব্দের মিশ্রণেই **Reprography** শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। শব্দটি সৃষ্টি হওয়ার প্রাথমিক স্তরে ফটোগ্রাফী পদ্ধতির সাহায্যে এক বা একাধিক কপি তৈরী করাকেই রেপ্রোগ্রাফী বলা হত। বর্ত্তমানে ফটোগ্রাফী ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতে কপি করাকে রেপ্রোগ্রাফী বলা হয়ে থাকে।

আজ রেপ্রোগ্রাফী তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি আলোচনা করা যাক।

(ক) খুব সহজ উপায়ে কপি করা যায়।

(খ) মূল লেখ্য বস্তু যাই হোক, তার ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির হুবহু নকল এতে মুদ্রিত হয়ে যায়।

(গ) খুব কম খরচে অল্প সময়ে গবেষণার বিষয়বস্তু গবেষকের জন্য না ছেপে গবেষককে সাহায্য করার সহজ উপায়।

(ঘ) প্রয়োজনমত লেখার **enlargement** অথবা **reduction** করা যায়।

(ঙ) অনেক মূল বই গবেষকের নিকট পাঠানো সম্ভব হয় না। তখন **reprography**-র মাধ্যমে তাকে নকল করে পাঠানো সম্ভব।

(চ) রেপ্রোগ্রাফীর সাহায্যে মূল লেখা বা কপিটিকে ছোট করে পাঠকের নিকট পাঠানো সম্ভব।

(ছ) তথ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থা রেপ্রোগ্রাফী সহজতর করে দিয়ে থাকে।

রেপ্রোগ্রাফীর সংজ্ঞা :—বিভিন্ন বিজ্ঞানী রেপ্রোগ্রাফীর নানা রকম বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে **H. R. Verry**র মতে "রেপ্রোগ্রাফী কপি করার কলা এবং বিজ্ঞান এতে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার নীতি অনুসরণ করা হয়"। **Encyclopaedia of Librarianship** এর মতে "The art of producting Single or multiple copies of documents' whether by photographic or other means". বাংলায় বলা যায়, ফটোগ্রাফী বা অন্য কোন পদ্ধতিতে বইপত্রের এক বা একাধিক কপি করার পদ্ধতিকে রেপ্রোগ্রাফী বলা হয়। **G. T. Pier** এর মতে রেপ্রোগ্রাফী হচ্ছে একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। এই পদ্ধতিতে বইপত্র হুবহু কপি করা এবং সূক্ষ্ম ফটোকপি করা যায়। এর চালিকাশক্তি হচ্ছে **Electro Process** ও **Thermoprocess.**

আজকাল রেপ্রোগ্রাফীকে প্রধানত তিনটি ব্যবস্থার বহুল প্রচলন দেখা যায়।

ফটোষ্ট্যাট (Photostat) : ফটোষ্ট্যাট একটি বাণিজ্যিক নাম। এটি একটি বিশেষ কোম্পানীর মেশিন এবং তার থেকেই যে কপি পাওয়া যায় তাকে **Photostat** বলা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটির প্রধান অঙ্গ হচ্ছে একটি বৃহৎ ক্যামেরা। এর সাহায্যে মূল নথির সংকুচিত ছবি পাওয়া যায়। মূল নথিটি যতই অস্বচ্ছ হোক না কেন, এই পদ্ধতিতে ছবি বা নকল করার কোন অসুবিধা হয় না। ইংরাজীতে একে বলে **Translucent.** এই পদ্ধতি প্রিজম ব্যবহার করে পার্শ্ব পরিবর্তন এড়ানো হয়। এতে নেগেটিভ পাওয়া

যায় এবং একে মূল নথির জায়গায় বসিয়ে ইচ্ছেমত অনেক **Positive** কপি করা যায়।

একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, এই পদ্ধতিতে খুব উঁচুমানের স্থায়ী প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে বর্ধিত ও সংক্ষিপ্ত আকারের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এতৎ সত্ত্বেও যন্ত্রটির অসুবিধাও কম নয়। যন্ত্রটি আকারে বড়, ফলে অনেকটা জায়গা দখল করে থাকে। এর কাজের গতিও অনেক কম। কপির সংখ্যা বাড়লেও প্রতি এককের দাম কমে না।

মাইক্রোফটোগ্রাফী (Microphotography)—ক্যামেরার সাহায্যে কোন নথির খুব ছোট আকারের ছবি তৈরী করা মাইক্রোফটোগ্রাফীর কাজ। ছবিটি আকারে এতই ছোট হয় যে খালি চোখে তা দেখা যায় না। দেখতে হলে Projector বা Reader এর সাহায্য নিতে হয়। তা না হলে ছবিটি বড় করতে হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া ছবি দুরকমের হয়ে থাকে, যেমন, স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ। স্বচ্ছ প্রতিকৃতি দুরকমের হতে পারে, যেমন **Microfilm** এবং **Microfish.** রেপ্রোগ্রাফীর জগতে এই দুই মাধ্যমের গুরুত্ব খুব বেশি। অস্বচ্ছ মাধ্যম দুরকমের, যেমন মাইক্রোকার্ড এবং মাইক্রোষ্ট্রিপ্ (Microstrip)। এ কথা বলা উচিত, স্বচ্ছ মাধ্যমগুলোর তুলনায় অস্বচ্ছ মাধ্যমদুটির গুরুত্ব কম। সেই সঙ্গে ব্যবহারও কম।

মাইক্রোফিল্ম (Microfilm)—যে লম্বা ফিল্মে এই ধরণের সূক্ষ্ম চিত্র সৃষ্টি করা হয়, তার পরিধি ৮ মিলিমিটার, ১৬ মি. মি., ৩৫ মি. মি., ৭০ মি. মি. এবং ১০৫ মি. মি. হয়ে থাকে। সাধারণ আকারের নথি বা চিত্রের জন্য ৭০ মি. মি. পরিধি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতি ছবি সৃষ্টির জন্য দুধরণের ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। এদের নাম ফ্লো ক্যামেরা (Flow Camera) এবং প্লানেটরি ক্যামেরা। এই পদ্ধতিতে মূল নথির তুলনায় অনেক কম জায়গা লাগে। পুরনো ক্ষতিগ্রস্থ বইকে এই পদ্ধতির সাহায্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা যায়।

মাইক্রোফিস (Microfich)—মাইক্রোফিলমে প্রতিচ্ছবিগুলোর রৈখিক বিন্যাস দেখা যায়। অর্থাৎ ফিল্মে একের পর এক প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। মাইক্রোফিসে প্রতিচ্ছবিগুলোর বিন্যাস দ্বিমাত্রিক। কার্ড আকৃতির মাইক্রোফিসের আকার নানা রকম হয়। তবে ৭৫×১২৫ মি. মি. এবং ১০৫×১৪৮ মি.মি. আকার বেশী দেখা যায়। মাইক্রোফিস তৈরীর জন্য

বিশেষ ধরণের টোপ এবং repeat ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এগুলো খামের মধ্যে রাখা যায় বলে তথ্যক্ষেত্রে এগুলোকে রক্ষা করতে খুবই সুবিধা হয়। এখানে বলে রাখা দরকার মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিস্ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন পড়া যায়, তেমনি প্রয়োজনমত ছাপা কপি তৈরী করাও সম্ভব।

তড়িৎ পদ্ধতি (Electrography)—তড়িৎকে দিয়ে এই কপি পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হয়। এখন একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন জেরোগ্রাফী (Xerography) এবং ইলেকট্রোফ্যাক্স (**Electrofax**)। জেরোগ্রাফীতে সেলেনিয়মের (Selenium) পাত ব্যবহার করা হয়। এই পাতে বা প্লেটে স্থিয় **Electricity** সহজেই ধরা পড়ে।

ইলেক্ট্রোফ্যাক্স পদ্ধতিতে ছাপাবার কাগজের মধ্যেই বিশেষ প্রলেপ থাকার জন্য তড়িৎ ধরা যায়।

১৯৩৭ সালে **C.F. Carlson** জেরোগ্রাফী সৃষ্টি করেন। এটি মুখ্যতঃ শুষ্ক, দ্রুত ও প্রত্যক্ষ পজিটিভ করার প্রক্রিয়া। রেপ্রোগ্রাফীর কথা আলোচনা করলে জেরোগ্রাফীর কথা অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এই পদ্ধতিতে সেলেনিয়মযুক্ত একটি তড়িৎ পরিবাহী প্লেট ব্যবহার করতে হয়। এই পাতে বা প্লেটে আলো পড়লে তড়িৎ অপসারিত হয়। আলোচিত নথির সামনে এই প্লেট বা পাত রাখলে একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ লেখা বা আঁকা অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয় না। কেবল নথির খালি জায়গা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে প্লেটের অনুরূপ জায়গায় তড়িৎ অপসারণ করে। প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি যুক্ত প্লেটটিকে বিপরীত তড়িৎযুক্ত গুঁড়ার আস্তরণ দিলে প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ওঠে। এই পাতের বা প্লেটের উপর কাগজ রেখে কপি পাওয়া যায়। কাগজের কপিকে স্থায়ী করার জন্য তাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আজ একথা কারো অজানা নয়, যান্ত্রিক প্রগতির ফলে ধাপে ধাপে কাজ করার পরিবর্ত্তে সরাসরি এবং স্বয়ংক্রিয় ভাবে বহু কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

জেরোগ্রাফীর অনুরূপ আর এক পদ্ধতির নাম ইলেক্ট্রোফ্যাক্স। ইলেক্ট্রোফ্যাক্স পদ্ধতিতে সেলেনিয়ম প্লেট থেকে কাগজে প্রতিচ্ছবি স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয় না। এখানে সেলেনিয়ম প্লেটের বদলে জিংক অক্সাইড (**Zinc Oxide**) এর প্রলেপযুক্ত কাগজ ব্যবহার করা হয়।

তাপের সাহায্যে কপি করার পদ্ধতি (Thermography)—তড়িৎ পদ্ধতির মত এটিও একটি শুষ্ক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি পাতলা (Heat Sensitive) কাগজ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ আলোয় এই কাগজে কোন বিক্রিয়া হয় না। বিক্রিয়ার জন্য অবহেলিত বিকিরণের (Infra-red radiation) প্রয়োজন। মূল নথি ও সুবেদী কাগজকে সংস্পর্শে রেখে অবহেলিত বিকিরণ প্রয়োগ করা হয়, নথির সাদা বা ফাঁকা অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়। কেবলমাত্র অক্ষরগুলো আলো শোষন করে সুবেদী কাগজে পাঠায়। ফলে সুবেদী কাগজে মূল নথির অনুরূপ কপি পাওয়া যায়। পদ্ধতিটি সুন্দর হলেও এতে স্থায়ী কপি পাওয়া যায় না।

ডায়াজো পদ্ধতি (Diazography)—এই পদ্ধতিতে একটি জিনিষ লক্ষণীয় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এক ধরণের রঙ তৈরী করে এবং অতিরিক্ত বেগুনী রশ্মির বিকিরণে তা ধ্বংস করে। ডায়াজো যৌগিকের এই গুণ দুটিকে কাজে লাগিয়ে এই পদ্ধতিতে কপি করা হয়। ডায়াজো যৌগিকের প্রলেপযুক্ত কাগজের সঙ্গে মূল নথি স্পর্শ করে কপি করার কাজ সমাধা করা হয়। এ ধরণের কাজে অতি বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। এতে কম খরচে কপি পাওয়া যায়। এটি একটি শুষ্ক পদ্ধতি এবং এর পজিটিভ কপি পাওয়া সম্ভব।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও রেপ্রোগ্রাফীর নানা পদ্ধতি রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করছি, তবে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না কারণ এগুলো প্রায় অধিকাংশ তথ্যকেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে বহুকাল ধরে চলে আসছে, যেমন ডুপ্লিকেটিং পদ্ধতি যার মধ্যে পড়ে ষ্টেনসিল পদ্ধতি ও অফসেট পদ্ধতি ইত্যাদি।

রেপ্রোগ্রাফিক নথিপত্রাদি সংগঠন করবার জন্য প্রথমেই তাকে UDC (Universal Decimal Classification) দ্বারা বর্গীকরণ করতে হবে এবং AACR 2 (Anglo-American Cataloguing Rule no. 2) সাহায্যে সূচীকরণ করতে হবে। এজাতীয় নথির বর্গীকরণের জন্য আমার মনে হয় UDC গ্রহণযোগ্য এবং AACR হতে যে নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলোর সাহায্যে সূচী প্রস্তুত করার উপায় বলে মনে হয়। যেহেতু এগুলো বিশেষ ধরণের নথি সেজন্য এগুলো আহরণ এবং সংরক্ষণে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। রেপ্রোগ্রাফীকে নথি রাখবার জন্য একধরনের সেল্ফ ব্যবহার করা হয়

যাকে ইংরাজীতে বলে Multipurpose Store well. অবশ্য যদি রেপ্রোগ্রাফী সংগ্রহ অল্প হয়। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মাইক্রোগ্রাফীক দ্রব্যাদি যেন সূর্যকিরণ থেকে দূরে থাকে। অত্যধিক উষ্ণ আর্দ্রতাযুক্ত আবহাওয়া হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। সংরক্ষণ করার পূর্বে ফিল্ম শুকনো করে নেওয়া প্রয়োজন। ধুলা ময়লা থেকে পরিস্কার রাখতে হলে নরম ধরণের ব্রাস ব্যবহার করতে হবে।

পরিশেষে বলতেই হয় যে আজকে Reprographic দ্রব্যাদির চাহিদা তথ্য-ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এসব দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

References

1. Vishana, A. A—Organisation and Management of Mycrographic Systems (In Souvenir—Regional Seminar on Management and Application of Micrographics, 25-26 August, 1988).

2. Olle, I.G.—A Guide book to Sources of Information in Libraries. 1984.

3. Chakraborty, A.R.—Tathyabigganer Ruprekha. 1986.

সপ্তদশ অধ্যায়

কমপিউটারের ক্রমবিকাশ ও প্রজন্ম

একটি ধারণা আমাদের দেশে দেখা যায়—কমপিউটারকে নিয়ে, কমপিউটার দুর্বোধ্য যন্ত্র। যারা বিজ্ঞান জানেন না, তারা কমপিউটার নিয়ে কাজ করতে পারেন না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কমপিউটারের কাজ আদৌ কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান না জানলেও কমপিউটার নিয়ে কাজ করা যায়। কেট্‌লি থেকে বেরনো বাষ্প দেখে বিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ ওয়াটের মনে ষ্টিম ইঞ্জিন ডিজাইন করায় চিন্তা জাগে এবং তাকে যদি ষ্টিম ইঞ্জিনের পূর্ব-পুরুষ ধরা যায় তবে কম্‌পিউটারের পূর্বসূরীর বয়স কম করেও সাড়ে তিন হাজার বছর হবে। আর যদি ওয়াটের রকেটকে প্রথম ষ্টিম ইঞ্জিন ধরা যায়, তবে কমপিউটারের যে মডেলটি প্রথম তৈরী হয়েছিল তা একশো বছর অতিক্রম করেছে। চীন দেশে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে একটি গণনা কার্যে সহায়ক যন্ত্র তৈরী হয়েছিল। এর নাম ছিল অ্যাবাকাস (Abacus)। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা রিষ্টওয়াচ ও ক্যালকুলেটার নিয়ে কাজ করছি তখনও অ্যাবাকাসের ব্যবহার চালু রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে।

(ক) **অ্যাবাকাস** যন্ত্রটি আজকাল ছোটদের খেলনা হিসাবে কিনতে পাওয়া যায়। একটা কাঠের বা প্লাস্টিকের ফ্রেমে অনেকগুলো সমান্তরাল রড লাগানো থাকে। সেই রডে গোল গোল কাঠের বল ঢোকানো থাকে। ফ্রেমটার দুটো ভাগ। বড় ভাগটির প্রতিটি রডে পাঁচটা করে আর ছোট ভাগটির প্রতিটি রডে দুটো করে বল ঢোকানো থাকে। এটি যদিও আমরা খেলনা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু এটি হচ্ছে সেই চার হাজার বছর আগেকার অ্যাবাকাস (Abacus)। ফ্রেমের বড় অংশটির রডে ঢোকানো প্রতিটি বল 'এক' সংখ্যাকে বোঝায়, আর ছোট অংশটির রডে ঢোকানো প্রতিটি বল 'পাঁচ' সংখ্যাকে বোঝায়। সাধারণতঃ সব বলই ফ্রেমের কিনারের দিকে সরানো থাকে। অঙ্ক কষার সময় ওই জায়গা থেকে বলগুলোকে প্রয়োজনমতো ফ্রেমের বিভাজক পার্টিশনটির দিকে সরিয়ে আনা হয়। যেমন বড় অংশের রড থেকে দুটো বল সরিয়ে ওই বিভাজক

অংশের দিকে সরিয়ে আনলে ১+১=২ বোঝায়। ঠিক তেমনি ছোট অংশ থেকে একটা বল বিভাজকের দিকে সরালে ৫ বোঝায়। এভাবে রডে ঢোকানো বলগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করা যায়। যাই হোক অ্যাবাকাসকেই কম্পিউটারের এবং ক্যালকুলেটারের প্রথম পূর্বপুরুষ বলা চলে।

(খ) **জন নেপিয়ারের হাড়**—অ্যাবাকাসের আবিস্কারের ফলে বড় বড় যোগ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে যোগ করতে হলে তা বেশি কাজে লাগত না। ১৬১৪ সালে প্রখ্যাত স্কটিশ গণিতজ্ঞ জন নেপিয়ার (**John Nepier**) দ্রুত বড় বড় গুণ করার এক বিশেষ পদ্ধতি আবিস্কার করলেন। এই পদ্ধতিতে দশটা লম্বা লম্বা হাড়ের তৈরী আয়তক্ষেত্রাকার রডের উপর একটি সংখ্যার টেবিল এমনভাবে খোদাই করা থাকতো, যাতে রডগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে রাখলে সম্পূর্ণ টেবিলটা পড়া যেত, আর কোনাকুনি কাটাদাগগুলো পাশের গায়ে কাটা মগের সঙ্গে মিলে গিয়ে লম্বা লম্বা কোনাকুনি দাগের সৃষ্টি করতো। নেপিয়ারের আবিস্কৃত এই ব্যবস্থাকে নেপিয়ারের হাড় বলা হত।

এবার দেখা যাক, নেপিয়ারের হাড়ের যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কি করে গুণ করতে পারি। ধরা যাক A-র সঙ্গে K গুণ করতে হবে। আমরা তাহলে নেপিয়ারের হাড় থেকে R সংখ্যার হাড় চারটে বেছে নিয়ে হিসাবে পাশাপাশি সাজাবো। তারপর নম্বরের সারিতে (**Row**) যে সব সংখ্যা আছে সেগুলোকে ওই কোনাকুনি কাটা লাইন অনুসারে যোগ করলেই সঠিক গুণফল পেয়ে যাবো।

স্লাইডরুল পদ্ধতি—১৬২০ সালে এক ইংরেজ গণিতজ্ঞ উইলিয়াম অগট্রেড ওই লগরিদম পদ্ধতির উপর নির্ভর একটা স্লাইডিং স্কেল বানান। স্কেলটার দুটো অংশ। একটি সরু এবং অপরাংশ মোটা। বড় একটা চওড়া স্কেলের মধ্যে একটি কাটা খাঁজের মধ্যে বসানো থাকে সরু স্কেল। সরু স্কেলটাকে ও খাঁজের মধ্যে বড় স্কেলটার উপর এপাশ ওপাশ স্লাইড করে সরানো যায়। বড় স্কেলে এবং ছোট স্কেলে যোগ বিয়োগ গুণভাগ, বর্গমূল ইতাদি বার করার জন্য বিভিন্ন সংখ্যা খোদাই করা থাকে। যদিও আধুনিক ক্যালকুলেটরে যত বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করা যায় স্লাইড রুলে তত বড় সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক করা যায় না। তাছাড়া স্লাইড

রুলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তাকে স্কেলের গায়ে খোদাই করা টেবিল থেকে পড়তে হয়। পড়বার সময় কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, যেটা আধুনিক ক্যালকুলেটরের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(ঘ) **পাসকেলের যন্ত্রগণক**—স্লাইডরুল সুবিধাজনক হলেও এটাকে ব্যবহার করতে হলে রীতিমত অভ্যাস থাকা চাই। স্লাইডরুল তৈরীর বাইশ বছর পরে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক পাসকাল (Blaise Pascal) এমনি একটি যন্ত্রগণক তৈরী করেছিলেন। পাসকেলের যন্ত্রগণকটি ছিল পূর্ববর্তী সমগ্র যন্ত্রগণকের থেকে পৃথক। অ্যাবাকাসের মত এতে কোন বল ছিল না, নেপিয়ারের যন্ত্রের মত কোন চ্যাপটা আয়তক্ষেত্রের আকারের হাড় ব্যবহার করা হয়নি। এমনকি স্লাইডরুলের মত এতে কোন স্কেলও ছিল না। যন্ত্রগণকের মধ্যে ছিল কেবল নানা আকৃতির পিন লাগানো চাকতি যেগুলি Gear এর মত কাজ করতো। যন্ত্রটার উপরে ছিল অনেকগুলো ডায়াল, আর ছিল ছোট ছোট জানালা। জানালাগুলোর ঠিক পিছনে ছিল 0 থেকে 9 লেখা চাকতি, যেমন ট্যাক্সির মিটারে থাকে। যখন অংক কষতে হতো, তখন ঐ জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের জানালার অংকের সংখ্যাগুলো আনতে হত। গিয়ারের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা ছিল যাতে এককের জানালার পেছনের যে সংখ্যা লেখা চাকতিটা লাগানো সেটা একপাক ঘুরলেই দশকের জানালার পিছনের চাকতিটা একঘর সরে যেতো।

কার্যগত দিক থেকে পাসকেলের এই যন্ত্রগণক মোটেই জটিল ছিল না তখনকার দিনে। এটা দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একথা সঠিক যে, তখনকার যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যা খুব উন্নত না হওয়ার জন্য পাসকেলের যন্ত্রটি খুব নির্ভরযোগ্য করে তৈরী করা সম্ভব হয়নি।

(ঙ) **ব্যাবেজের ইঞ্জিন**ঃ এবার আমরা ব্যাবেজের ইঞ্জিন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গণিত বিশারদ Charles Babbage প্রথম যন্ত্রগণকের স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। ব্যাবেজের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রগণকে যান্ত্রিক গীয়ার লাগানো থাকতো এবং গণনা চালানোর সময় পরিচালককে গুণে গুণে গীয়ারের হাতল চালাতে হত।

ফলে যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত অঙ্ক কষার ক্ষমতা নির্ভর করত পরিচালক কত তাড়াতাড়ি হাতল ঘোরাবেন তার উপর। ব্যাবেজ বুঝেছিলেন সত্যিকারের কার্যকরী গণনা যন্ত্র তৈরী করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা যান্ত্রিক স্মৃতি ভাণ্ডারের। এই স্মৃতি যে সব অঙ্ক কষার প্রয়োজন, তার তথ্য প্রথমে প্রবেশ করিয়ে দিলে যন্ত্রগণক তার পরবর্তী কাজকর্ম আরো সহজে করতে পারবে। ব্যাবেজ ঠিক করলেন যন্ত্রগণকে হাতল ঘুরিয়ে যোগ বিয়োগ না করে নির্দেশ পাঞ্চকার্ডের মাধ্যমে দেওয়া হবে। পাঞ্চকার্ডের ব্যবহার ব্যাবেজের আমলেই শুরু হয়েছিল। তাঁর পরিকল্পিত মেশিনের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা হল একই ধরণের অঙ্ক কষার প্রয়োজন হলে অ্যানালিটিক্যাল একটা যান্ত্রিক আবর্ত্ত বা লুপ প্রোগ্রামে পরিচালনা করা। এই পদ্ধতি আধুনিক কম্পিউটারে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। ব্যাবেজ অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের ডিজাইনটা এমনভাবে করেছিলেন যাতে গণনা হয়ে যাবার পর উত্তরটা ছেপে বেরিয়ে আসে। যদিও সে যুগে ব্যাবেজ সরকারী অনুদান ও নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি নিঃশেষ করে তাঁর স্বপ্নের অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের রূপদান করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তা স্বপ্নই রয়ে গেল। তবে তাঁর ভাবনা ছিল যুগান্তকারী। তাঁকেই আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

(চ) **পিন হুইল যন্ত্রগণক**ঃ এবার আমরা পিন হুইল যন্ত্রগণক সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। ১৮৭৮ সালে ডাবলু, টি. ঠনারে একটা উন্নত যন্ত্রগণক তৈরী করলেন—তার নাম পিন হুইল। ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে পিন হুইল চালালে খুবই দ্রুত গণনা করা যেত। আজকাল যে সব যান্ত্রিক যন্ত্রগণক ব্যবহার করা হয়, তা পিন হুইলেরই পরিমার্জিত সংস্করণ। এরই কিছুদিন পর কম্পটোমিটার নামে আর একটি যন্ত্র তৈরী হল। এই যন্ত্রে গণনার তথ্য কী বোর্ডে টিপলে প্রোগ্রাম করা যায়।

(ছ) **হলরিথের পাঞ্চকার্ড**ঃ কম্পিউটারের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ডঃ হরমেন হলরিথ চাকরী করতেন আমেরিকার সেন্সাস অফিসে। ১৮৮৭ সালে আমেরিকায় সেন্সাস করা হল। যে কোন দেশেই সেন্সাস একটা দুরূহ কাজ। এই কাজ করার জন্য তৎকালীন আমেরিকার সেন্সাস ব্যুরো একটি প্রতিযোগীতার কথা ঘোষণা করেন। প্রতিযোগীতার বিষয় ছিল দ্রুত যন্ত্রগণক তৈরী করা যেটা

সেনসাসের কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। হলরিথ এমনি একটি মেশিন তৈরী করে প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করলেন। হলরিথ ব্যাবেজের পরিকল্পনা মত পাঞ্চকার্ড তৈরী করে ব্যবহারও করেছিলেন। তবে ব্যাবেজের যন্ত্রগণক ব্যবহার হত তার পাঞ্চ কার্ড থেকে তথ্য পড়বার জন্য; সে জায়গায় হলরিথ ব্যবহার করলেন ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ব্যবস্থা। যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে তথ্য পড়ার গতি আরো দ্রুত এবং নির্ভুল হলো। হলরিথের ব্যবস্থায় পাঞ্চ কার্ড গুলোকে পারাভর্তি পাত্রের উপর রাখা হত। যে পিনের নিচে কার্ডে ফুটো থাকতো, সেই পিনটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে নিচের পাত্রে রাখা পারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বৈদ্যুতিক সার্কিট পূর্ণ করতো। আর যে সব পিনের নিচে কার্ডে কোন ফুটো থাকতো না, সেইসব পিনের বৈদ্যুতিক সার্কিট পূর্ণ হতো না। এ ব্যবস্থা কিছুটা পরিমার্জিত উপায়ে এখনও কিছু কিছু আধুনিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কমপিউটার পাঞ্চকার্ড রিডার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। হলরিথের মেশিন পরবর্তী চার দশক ধরে জনপ্রিয় ছিল। ইলেকট্রনিকসের বিকাশের সঙ্গে হলরিথের মেকানিক্যাল গণনা মেশিনের চাহিদাও নিঃশেষ হয়ে গেল। হলরিথ পরবর্তীকালে ১৯১১ সালে দুটি ভিন্ন কোম্পানীর সহযোগীতায় Computing tabulating recording company খোলেন। এই কোম্পানীটি পরে বিশ্ববিখ্যাত IBM (International Business Machine)-এ রূপান্তরিত হয়।

(জ) **হাওয়ার্ড আইকেনের যন্ত্রগণক ঃ** এরপর আমরা হাওয়ার্ড আইকেনের সঙ্গে পরিচিত হব। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড আইকেন (Howard Aiken) IBM কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব দেন যে এমন একটা যন্ত্রগণক তৈরী করা হোক যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন গাণিতিক ক্রিয়াগুলোকে পরস্পর সাজিয়ে নিতে পারবে। অসংখ্য বৈদ্যুতিক রিলে এবং গোছা গোছা তার দিয়ে ১৯৪৮ সালে তৈরী হলো সেই যন্ত্রদানব। যন্ত্রটা ১৯৪৮ সাল থেকে ১১ বছর সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কামানের গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির গতিপথ অংক কষে বার করতে এর সাহায্য নেওয়া হতো। কিন্তু তার গণনা ক্ষমতা বৈদ্যুতিক রিলে ব্যবহারের দরুণ সীমিত ছিল। রিলে ছাড়া সে সময়ে আর দ্বিতীয় কোন উচ্চগতির সুইচ পাওয়া যেতনা। এ অসুবিধা দূর হলো ইলেকট্রনিক ট্রায়োড ও ডায়োড ভাল্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে।

(ঝ) **কম্পিউটারের চারটি প্রজন্ম ঃ** প্রথম প্রজন্মে আমরা দেখতে পেলাম কম্পিউটারে ভ্যাকুয়াম টিউব (Vacuum tube) এর ব্যবহার। এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো একটু ভারী, স্লথগতি এবং খুব বেশী বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। দ্বিতীয় প্রজন্মে কম্পিউটার ট্রানজিসটারের (Transistor) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল এবং এর সঙ্গে রইল প্রসেসর ব্যবস্থা যা আকৃতিগতভাবে ছোট হয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হল। তৃতীয় প্রজন্মে দেখা গেল, কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক সারকিটের (Electronic Circuit) ব্যবহারের ফলে দ্রুততার সঙ্গে সঠিক কাজ সঠিক সময়ে বিশ্বাস যোগ্যতার সঙ্গে সমাধান করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। চতুর্থ প্রজন্মে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা একটা ছোট সারকিট না নিয়ে বরং একটা বিশাল সার্কিটকেই অতি ক্ষুদ্র করে মাপে পুরে ফেলার জন্য গবেষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত দুই ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া আর এক অষ্টমাংশ ইঞ্চি পুরু একটা শুঁয়োপোকার মত দেখতে প্যাকিং এর মধ্যে এক থেকে বেশী ট্রানসিসটার আর সেই রকম সংখ্যা রেসিষ্টার আর ক্যাপাসিটর দিয়ে তৈরী একটা প্রকাণ্ড সার্কিট ভরে দেওয়া হল। এই ক্ষুদ্রায়তন পদ্ধতির নাম দেওয়া হল VLSI (Very large scale investigation) এর সাহায্যে একটা কম্পিউটারকে (ইনপুট, কী বোর্ড, আউট পুট, ডিসপ্লে আর প্রিন্টার সমেত) এক পকেট ক্যালকুলেটরের মাপে তৈরী সম্ভব হচ্ছে। চতুর্থ প্রজন্মের সাইজ এখন একটা পেপারব্যাক পকেট বই এর থেকেও অনেক ছোট, অথচ এখানে প্রোগ্রাম করার জন্য টাইপ রাইটারের মত কী বোর্ড আছে। আউট পুট ডিসপ্লেতে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম আর তার উত্তর ফুটে উঠছে, দরকার মত ওরই মধ্যে যে ক্ষুদ্র প্রিন্টার আছে তাতে সরু একটা কাগজের ফিতের উপর সমস্ত তথ্যগুলো ছাপিয়ে বেরিয়ে আসছে। এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে ওই VLSI টেকনোলজির জন্য। এই প্রজন্মে VLSI সার্কিটগুলোকে সাধারণভাবে মাইক্রো প্রসেসর বলা হয়। তাই ছোট ছোট চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারকে মাইক্রো কম্পিউটার বলা হয়।

আমরা বর্ত্তমানে স্কুলে বা কলেজে যে মাইক্রো কম্পিউটার দেখছি সেগুলো সবই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার।

আজ কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার দেখতে আগ্রহী। তাদের বক্তব্য হল, যতদিন না কম্পিউটার পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে

পারছে, আর তার গলার আওয়াজ নিয়ে প্রোগ্রাম নিতে পারছে, ততদিন কম্পিউটার টেকনোলজির কি আর উন্নতি হয়েছে। তবে অবশ্য কথা বলা কম্পিউটার এখনই তৈরী হয়ে গেছে। কথা প্রোগ্রামিং নেওয়া অথবা কম্পিউটারে আউটপুট হিসাবে গলার স্বরের ব্যবহার এখন গবেষণাগারের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। তবে আশার কথা সম্ভবতঃ ১৯৯০ সালের পর থেকে কম্পিউটার আমাদের এ ধরণের সুফল দিতে আরম্ভ করবে বলে মনে করি। হয়ত দেখা যাবে **Naturnal language** এ **Index** করবার জন্য তথ্য কেন্দ্রে বসে কম্পিউটারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে আর কম্পিউটার সে কাজ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সমাধা করে দেবে। সেটাই হবে কম্পিউটারের পঞ্চম প্রজন্ম।

References

1. Mahapatra. P.—The Computer in Library. 1915
4. Mitra, S.—Computer & Programming. 1987

অষ্টাদশ অধ্যায়

কমপিউটার, তার আকৃতি এবং তথ্য বিজ্ঞানে তার পরিধি

(ক) কমপিউটার ঃ—

বর্তমান যুগে যে কমপিউটারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তার অবয়বের মধ্যে চারটি প্রধান অংশ আছে। যেমন, ইনপুট, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, মেমরি ও আউটপুট। কমপিউটার ইনপুটের মাধ্যমে যে সমস্যা তাকে সমাধান করতে হবে, সেই সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য জানাতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি, ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে যখন কমপিউটারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং, আর নির্দেশ হচ্ছে প্রোগ্রাম। যিনি কমপিউটার পরিচালনা করেন, তিনি হচ্ছেন প্রোগ্রামার। কমপিউটারের প্রোগ্রাম যখন প্রথম দেওয়া হয়, তখন তা স্মৃতিভাণ্ডারে জমা থাকে। কমপিউটার প্রোগ্রাম শেষ হবার পর কমপিউটারের সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তথ্য স্মৃতিভাণ্ডার থেকে নিয়ে এনালিসিস বা বিশ্লেষণ করে দেখে। সি. পি. উ এর মধ্যে রয়েছে এ্যারিথমেটিক বা আঙ্কিক ইউনিট যা প্রয়োজনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দ্বারা সমস্যার সমাধান করে দেয়। এর সঙ্গে থাকে লজিক্যাল অপারেশন ইউনিট, যা দুটি মানের তুলনামূলক বিচার করে ইনপুট ও আউটপুট অপারেশন ইউনিটের মাধ্যমে ডাটা সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং তা মেমরিতে সঞ্চয় করে। এরপর তা থেকে বিশ্লেষণের পর ফলাফল প্রকাশ করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মই হচ্ছে ইনপুট আউটপুট অপারেশন।

সি. পি. উ যখনই কোন তথ্যের পুরো বিশ্লেষণ করে, তখনই তা টিভির মত একটা যন্ত্রের পর্দায় বা স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। এই যন্ত্রের নাম মনিটর বা বা ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট। এছাড়াও কমপিউটার পরিচালিত ছোট লেখা ছাপাবার যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য কাগজে ছেপে বেরিয়ে আসে। আর এই কাগজে ছাপানো কপিকে কমপিউটারের পরিভাষায় 'হার্ড' কপি বলা হয়। ইদানিং উন্নতদেশে আউটপুট ডিভাইস হিসাবে স্পিচ, প্রসেসর-রূপী

ইলেকট্রনিক সারকিট ব্যবহার হচ্ছে। আমরা জানি, যে কম্পিউটারে এ ব্যবস্থা যদি পুরোপুরি চালু হয়, তাহলে একদিন সে মানুষের গলার স্বরে উত্তর জানাতে পারবে। এবং প্রয়োজনে প্রোগ্রামের নির্দেশে সংগীতের সুর তৈরী করতে সক্ষম হতে পারে। এছাড়া আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কমপিউটারের আরেকটি ইন্দ্রিয় আছে, যাকে আমরা বলি 'কী' বোর্ড। এই কী বোর্ড অনেকটা টাইপরাইটারের মত দেখতে। এখানে ইংরাজী বর্ণ ও সংখ্যার বোতাম রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হরেক রকমের কী। এসব দিয়ে আরো অন্যান্য কাজকর্ম করা যেতে পারে। এখন দুটি বোতামের নাম করব, সেদুটির নাম হচ্ছে এনটার ও রিটার্ণ। যাই হোক সি. পি. উ কে অনেকে বলেন আসল কমপিউটার। এছাড়াও রয়েছে ব্রেন, মেমরি এবং সব রকমের কাজ করার ক্ষমতা। এতদ্ভিন্ন টেপ রেকর্ডার. ডিস্ক, ড্রাইভ ইত্যাদি অংশ কমপিউটারের সঙ্গে লাগানো থাকে। টেপরেকডারের টেপে বা রিলে যেমন আমরা মিউজিক সঞ্চয় করে রাখি, এবং খুশিমত সেগুলো বাজাতে পারি এও তাই। কমপিউটারের ক্ষেত্রে আমরা, তথ্যবিজ্ঞানীরা মিউজিকের বদলে তথ্যের খবরাখবর রিলে সঞ্চয় করে রেখে দিতে পারি। সেগুলো আবার সি. পি. উ টেপের থেকে নিয়ে যাবতীয় তথ্য নিজের স্মৃতিতে রেখে দিতে পারে। এইভাবে ইনফরমেশন বা তথ্য সঞ্চয় করে রাখার দায়দায়ীত্বটিও কমপিউটার নিয়ে নেয়।

(খ) **তথ্যবিজ্ঞানে কমপিউটারের পরিধি :—**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে যুগটা এল, তাকে আমরা ইলেকট্রনিকের যুগ অভিধায় ভূষিত করি। এবং কমপিউটার হচ্ছে এই ইলেকট্রনিক যুগের একটি আশীর্বাদ। এই অসম্ভব শক্তিধর যন্ত্রটির ব্যবহার আজ তথ্যবিজ্ঞানীরা তথ্যব্যবহারকারীর স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। তথ্যব্যবহারকে সিস্টেমসের মাধ্যমে সুসংগঠিত আকার দিতে পারে কমপিউটার। বর্তমানে উন্নত দেশগুলি যেভাবে অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্য দেবার কাজ করেছে, তা এক কথায় বিস্ময়কর। অনলাইন সার্ভিস বলতে আমরা বুঝি পরস্পর নির্ভরশীল সরাসরি কমপিউটারে রক্ষিত তথ্যাবলীর নিকটবর্ত্তী হওয়া। সহজকথায়, আমরা কমপিউটারে সঞ্চিত তথ্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পেতে পারি অনলাইন সার্ভিসকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে। আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, সারা বিশ্বের অগ্রগতি

নির্ভর করছে কম্পিউটারের ওপর। তাই ১৯৮০র দশককে বলা যেতে পারে সর্বক্ষেত্রে উন্নতির যুগ আর সে যুগের পুরোভাগে থাকছে কম্পিউটার। সেক্ষেত্রে আমরা, ভারতের তথ্যবিজ্ঞানীরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন কম্পিউটারের স্মরণাপন্ন হচ্ছি। এটাও আমাদের জানা যে মানুষ শারীরিক বা দৈহিক প্রয়োগের মাধ্যমে যা কিছু করে, তা সে সেবামূলকই হোক বা উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মই হোক, সবকিছুর পিছনেই একটা প্রয়োগ কৌশলের নীতি থাকে। সে সব কাজই আবার কম্পিউটারই করে থাকে, যদিও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন মার্ক গ্রন্থপঞ্জী সেবা (**Mark Biliographic Service**)। এগুলো নূতন ধরণের সেবামূলক কাজ, যা দৈহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভব নয়। তথ্য বিশ্লেষণের ফলে আমরা কম্পিউটারে কাজকর্ম সহজতর করে তুলেছি। একটা কথাও আমাদের জানা যে, পৃথিবীময় তথ্য বিস্ফোরণের ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। এসব বিষয়ের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলেছে। এছাড়া অসংখ্য পেটেন্ট লিটারেচর, রিপোর্ট বিরাট সংখ্যক আকার নিয়ে প্রতিবছর প্রকাশিত হচ্ছে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যাপক সংখ্যক তথ্যব্যবহারকারীদের সেবা করতে হবে। আর এই তথ্য ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরণের তথ্য পেতে উৎসুক। আজ দৈহিকভাবে সেবা দিয়ে সমস্ত ধরণের জ্ঞানপিপাসু তথ্য ব্যবহারকারীদের দ্রুততার সঙ্গে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এজন্যই প্রয়োজন এস, ডি, আই (**Selective discimination of Information**) সার্ভিস। কারণ এই কাজের প্রয়োগ কম্পিউটার ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও কম্পিউটার মানুষের মেধার বিকল্প নয়। এতদসত্ত্বেও বলতে বাধা নেই, কম্পিউটার যে কোন কাজকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করে থাকে। আর তথ্য পরিসেবার কাজকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করাই তথ্য বিজ্ঞানীর প্রধান দায়িত্ব। এজন্যই আমাদের তথ্যবিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় তথ্য-বিজ্ঞানী স্বনামধন্য ডঃ আই. এন. সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর সেনগুপ্তস থিয়োরী অফ বিবলিওমেট্রিকসের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের বিষয়ে তথ্য সরবরাহকে দ্রুততার সঙ্গে পাঠকের কাছে পেঁাছে দেবার উপায় বলে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও কম্পিউটারের প্রয়োগ অপরিহার্য। এখানেই কম্পিউটার আমাদের

সহায়ক শক্তি। এখন আর বলে বোঝাতে হবে না, কেন আমাদের কম্পিউটারের প্রয়োজন।

আমেরিকাতে অনলাইন সার্ভিস যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এসঙ্গে বলতে পারি, অটোমেশন বা কম্পিউটার আমাদের বৃত্তির সম্মান যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় তথ্য ব্যবহারকারীরা তথ্যকর্মীদের কাজকর্মের পদ্ধতির দিকে নজর দেওয়া শুরু করেছে। নূতন এই প্রযুক্তি বিদ্যা আজ প্রচণ্ডভাবে তথ্যবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রসারিত হয়েছে। আজ আর আমাদের বৃত্তিকে কেউ করণিকের বৃত্তি বলতে সাহস করে না। বরং আমরা হয়ে উঠেছি তথ্যবিশেষজ্ঞ। আমাদের দেশে, এই ধরণের তথ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক কাউলা, ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত এবং ডি, আর, টি, সি এবং ইন্‌স্‌ডকের তথ্যবিজ্ঞানীবৃন্দ।

(গ) কমপিউটার প্রয়োগের ক্ষেত্র ঃ

তথ্যকেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে কম্পিউটারকে প্রয়োগ করলে আমাদের সিস্‌টেমস এ্যাপ্রোচের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। সিস্‌টেমস্‌ এ্যাপ্রোচ হচ্ছে সেই প্রার্থিত উপায়, যার মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রে যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। তথ্য কেন্দ্রে সিস্‌টেমস্‌ বলতে শুধুমাত্র সাময়িক পত্রপত্রিকার মুদ্রিত তালিকা প্রস্তুত করণ বোঝায় না। সিসটেমস এ্যাপ্রোচের বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্রপত্রিকার গুণাগুণ বিচার এবং মুদ্রণের ব্যাপারে যুক্ত অন্যান্য যে সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সংযোগ রয়েছে—তাদের কথাও এসে পড়ে। সাময়িক পত্রপত্রিকার কথা বললে যেটি প্রধানত এসে পড়ে, সেটি হচ্ছে জার্নাল বা সাময়িক পত্রপত্রিকার চাঁদা (Subscription) নিয়ে চিঠি চাপাটি পাঠানোর প্রয়োগ কৌশল। এবং সেই সঙ্গে রিমাইন্ডার পাঠাবার নীতি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে যদি বিচার করা যায়, তাহলে তথ্যকেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারে যে সিসটেমসের মাধ্যমে নথিপত্রের ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হয়, তাকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তথ্যকেন্দ্রের মূলনীতি হবে, একটি অখণ্ড (Integrated) এবং পরস্পর নির্ভরশীল (Interactive) প্রক্রিয়া অনুসরণ।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কম্পিউটার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। (১) তালিকা প্রস্তুতকরণ (Listing) (২) হিসাব নিকাশ (accounting) (৩) সাময়িক পত্রপত্রিকার নথিভুক্তিকরণ (Periodicats registration)

(৪) পুস্তক লেনদেন পরিচালনা (circulation control) (৫) বই কেনার অন্য নির্দ্দেশ পাঠানো এবং তা গ্রহণ করা (Book ordering & acquisition) (৬) পুস্তক তালিকা এবং গ্রন্থপঞ্জী করণ (Catalogues & Bibliography) (৭) সম্পদের অংশ সঠিকভাবে বিভক্তিকরণ ও গ্রহণ (Resource sharing (৮) তথ্য ও তথ্যপঞ্জী সংগ্রহণের কাজ (Information bibliographical retrieval (৯) তথ্য পরিচালন ব্যবস্থা (Management of information)। যাই হোক কমপিউটারে কাজকর্ম করতে হলে আমাদের সি, পি, ইউ-এর কার্যাবলী বোঝার প্রয়োজন আছে। কারণ তা নাহলে তথ্য আদান প্রদানের কাজ কেমন করে সম্ভব। আবার সি. পি. ইউ বোঝবার আগে আমাদের কমপিউটার বাস-ব্যবস্থা (Computer Bus) সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। আমরা যারা কমপিউটারের সঙ্গে পরিচিত তারা জানি, কমপিউটারের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ, তথ্য আদান প্রদান সবই সি. পি, ইউ এই বাসের সাহায্যে করে থাকে। আমরা দেখেছি কমপিউটারের গায়ে সকেট থাকে, যার নাম I/O Port (Input output Port)। এই I/O Port হচ্ছে যা ইনপুট ডাইস থেকে তথ্য বয়ে নিয়ে যায় এবং কমপিউটার থেকে তথ্য আউটপুটে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি বিশেষ সকেট। এটা লক্ষ্য করা গেছে মাইক্রো কমপিউটারে একাধিক I/O Socket থাকে। I/O Socket এর Port এর সাহায্যে কমপিউটারের সঙ্গে প্রিন্টার, বাড়তি স্মৃতি ভান্ডার, মনিটার প্রভৃতি পেরিফেরালস্ লাগানো থাকে। আমাদের কাজ হচ্ছে তথ্য আদান প্রদান এবং তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট দ্রুততার সঙ্গে তথ্য পৌঁছে দেওয়া। একাজে ডাটাবাস আমাদের কেমন করে সাহায্য করে দেখা যাক। I/O Socket থেকে যে তারগুচ্ছ বেরিয়ে আসে, তাকে বলা হয় ডাটা বাস। ডাটাবাসের মাধ্যমে ইনপুট থেকে কমপিউটারে এবং কমপিউটার থেকে আউটপুটে তথ্য আদান প্রদান হয়। আধুনিক কমপিউটারে একই তারগুচ্ছের মাধ্যমে ইনপুটে ডিভাইস বা RAM/ROM স্মৃতি থেকে সি, পি, ইউ তথ্য পড়ে, আর আউটপুট ডিভাইস তথ্য পাঠিয়ে দেবার কাজ করে যায়। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, ডাটাবাস তথ্যবহনকারী তারগুচ্ছ বিশেষ। তাই আমরা ডাটাবাসকে বলতে পারি বহুমুখী কর্মের হাতিয়ার।

এ পর্যায়ে বলা যায় একই ডাটাবাসের সঙ্গে সি, পি, ইউ, RAM, ROM এবং I/O Port Controller Peripheral, IC গুলো লাগানো হয়। সর্বশেষে বলা যায় সি, পি, ইউ থেকে RAM/ROM এবং I/O port Controller Peripheral IC গুলোতে আলাদা নিয়ন্ত্রণের তার পাঠানো হয়। আর এই তার গুচ্ছের সি, পি, ইউ থেকে তথ্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়। কম্পিউটারের এই সমস্ত তারগুচ্ছকে এক কথায় বলা যায় Control Bus. পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে তথ্য পরিসেবার কোন কোন কাজগুলো কম্পিউটারের আওতাভুক্ত করা যায়। তাই কম্পিউটার বাস যেভাবে সি, পি, ইউ এর কাজ চালিয়ে যায়, তাতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তথ্য ব্যবস্থার জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারি।

References

1. Mahapatra, Dr. P.—The Computer in Library science 1985.
2. Gottfried, B. S.—Programming with BASIC, 1986.
3. Sampath S. Wason, S. K.—Basic Programming, 1918.
4. Mitra, S.—Computer & Programming, 1987.
5. Jaggi, V. P. & Jain S—Computer for beginners, 7th. ed. 1988.

ঊনবিংশ অধ্যায়

কিউয়িং পদ্ধতি

যে পদ্ধতির সাহায্যে সমস্ত কাজ কতকগুলি নিয়মবদ্ধ রীতির মাধ্যমে সমাধান করা যায় তাকে কিউয়িং বলে। এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করার সূত্র পাবার উপায় হচ্ছে কিউয়িং পদ্ধতি। আমরা সকলেই বটল্‌নেক, ব্যাকলগ, জ্যাম এবং সেই সঙ্গে কিউ ইত্যাদির সঙ্গে খুবই পরিচিত। সাধারণ ভাবে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জ্যাম বা গাদাগাদি বা ভীড়ের চাপ আমরা দেখতে পাই—কোন গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহে, ব্যাংকে, মেশিনসপে, হাসপাতালে, বাসষ্টপে, রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং সর্বোপরি কমপিউটার প্রক্রিয়ার মধ্যে। আধুনিক যুগে যে দিকেই তাকাই না কেন, আমাদের চোখে ভেসে ওঠে জ্যাম বা ভীড়ের চাপ। শুধুমাত্র বটল্‌নেক বা অপেক্ষামান ইউনিট আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করে না। সেই সঙ্গে পরিসেবার ক্ষেত্রে অলস সময় বা অকারণ সময় (idle time) অতিবাহিত করার কুফল আমাদের তথ্য ভিত্তিক সমাজের প্রচণ্ড সমস্যার কারণরূপে দেখা দেয়। যে সমস্ত পরিসেবার কাজ আমাদের তথ্যভিত্তিক সমাজে পরিলক্ষিত হয়, সেখানে দু'ধরণের কিউ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই সমস্ত কিউ ইউনিট যা অপেক্ষমান হয়ে আছে সেবা প্রদানের জন্য বা অন্যভাবে বলা যায় সেবকদের জন্য কিউ এবং সেই সঙ্গে আমরা বলতে পারি সেই সমস্ত কিউ যা সেবকদের কিউ খরিদ্দার বা ক্রেতা সাধারণের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে আমরা যারা তথ্য লেনদেন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত তাদের কাষ্টমার বা খরিদ্দার হচ্ছে তথ্য ব্যবহারকারীবৃন্দ। উল্লেখিত দুই ধরণের কিউ পদ্ধতির মধ্যে আর্থিক সমস্যা এসে পড়ে। মোট কথা আমরা কি চাই সেটা স্থির করতে হলে যে কোন সমস্যার মূলে চলে যেতে হবে। সমস্যার সমাধান এমনতাবে হোক যাতে একত্রিত অপেক্ষমান সময়ের মূল্য এবং অলস সময়ের মূল্য (**Waiting time & idle time**) ক্ষুদ্রতম মাত্রা পর্যন্ত কম করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে উদ্ভুত যে কোন সমস্যার সঠিক সমাধান বা উত্তর এমনভাবে করতে হবে যা দিতে হবে, যাতে

সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রকম পরিসেবার কাজ ন্যূনতম বা অল্পমূল্যে বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালিয়ে যেতে পারি। তাই আমাদের সমস্ত সমাধানের উপায় হচ্ছে এক শ্রেণীর মডেল বা মানদণ্ড বা প্রতিরূপ প্রস্তুত করে এগিয়ে যাওয়া। এই মডেল কাকে বলে ? এই মডেল হচ্ছে আমরা যাকে বলি কিউয়িং মডেল বা সারবন্দী প্রতিরূপ। একই ভাবে সমার্থক শব্দে বলা যায়, অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ (**Waiting line model**) বা অপেক্ষমান শ্রেণীর প্রতিরূপ বা মানদণ্ড।

অপেক্ষমান শ্রেণীর মানদণ্ড (**Waiting line model**) সর্বপ্রথম এই কিউয়িং পদ্ধতি বা অপেক্ষমান শ্রেণীর মানদণ্ডতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান, ১৯০৫ সালে কোপেনহেগেন টেলিফোন এক্স্চেঞ্জের একজন ইঞ্জিনিয়র। এই ভদ্রলোকের নাম, এ, কে, আরল্যাণ্ড। তিনি এই পদ্ধতি টেলিফোন অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অটোমেটিক টেলিফোন এক্স্চেঞ্জের ডিজাইন বা নক্সাকে সমৃদ্ধতর করেন। এই সঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অপারেশন গবেষকরা কিউ পদ্ধতিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে শুরু করলেন।

এখনকার দিনে অপেক্ষমান সারির তত্ত্ব বা **Waiting line theory** সঞ্চিত বা পুঞ্জিত করে রাখা সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে সর্বজন গ্রাহ্য উঠেছে। আমরা আজ সকলেই অনুভব করি যে শিল্প এবং ব্যবসার এই অপেক্ষমান সারির বা শ্রেণীর তত্ত্বে, ইংরাজীতে যাকে কিউয়িং তত্ত্ব বলা হয়, তা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ বা কিউ মডেল সেবামূলক কাজের নক্সা প্রস্তুতের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কিউ মডেল সকলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নিয়মনীতি নির্ভর অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু মডেল বা সুবিধাগুলো বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রের পরিকল্পনাতে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন—হাসপাতালে রুগী ভর্তির ব্যাপারে কিউ পদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান নিয়েছে এবং এত গাদাগাদি সত্ত্বেও রুগীরা পরের পর শয্যা পেয়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে, অনেকসময় রেলওয়ে ষ্টেশনে কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—কতগুলো

টিকেট কাউন্টার খুলে দিলে কিউ এর মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের টিকেট পেতে অসুবিধা হবে না। জন বহুল রাস্তায় দেখা যায়, যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সিগন্যাল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই কিউয়িং পদ্ধতি। অনেক বড় শহরে বহু সংখ্যক বাস রাস্তায় বের করা হয়, এই কিউ পদ্ধতির মাধ্যমে। একটি গ্রন্থাগার বা তথ্য কেন্দ্রে ভালভাবে কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন কিউয়িং পদ্ধতি। অর্থাৎ অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপই পারে সঠিক তথ্য সরবরাহকারীর নিকট পৌঁছে দিতে। এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার কমপিউটার পদ্ধতিতে টার্মিনালগুলোর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করার জন্যও দরকার কিউ প্রতিরূপ বা মডেলের। এখানে যা বলা হল তাতে জীবন ধারণের কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় কিউ মডেল প্রয়োগের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। আমাদের আলোচনা থেকে এটা মনে হতে পারে কিউ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে, এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ জটীলতা এসে পড়ে। অসংখ্য কিউয়িং মডেল বা অপেক্ষমান সারির প্রয়োগের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রতিরূপ দেখতে পাই। আর এই মডেল প্রস্তুত করে চলেছেন, বিভিন্ন গবেষণাগারে কর্মরত গবেষকরা। জীবনের প্রয়োজনে ক্রমেই এই কিউ মডেলগুলো সমৃদ্ধতর হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কিউ মডেলগুলো যতটা তত্ত্বগতভাবে আমাদের নিকট এসে হাজির হচ্ছে ততটা বাস্তব জীবনের প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত কিউ মডেলের সম্পর্কে আমাদের চেতনার স্তরকে উন্নত করতে পারি, ততক্ষণ এগুলোর সুফল পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র কিউ প্রয়োগের দায়ীত্ব গ্রহণ করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না, বরং প্রকৃত বাস্তব অবস্থায় ডাটা নির্ভর কিউ মডেল প্রস্তুত করলে তথ্য স্থানান্তরের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ গঠনের প্রক্রিয়া : (Formulation of Queuing model) :—

সেবার প্রয়োজনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কিউয়িং মডেল বা প্রতিরূপ গঠন কতকগুলো জটীল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে করতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, সেবার প্রয়োজনে ইউনিট্সের (Units) চাহিদা পূর্বের ন্যায় একইভাবে আসে না। এই ইউনিটসগুলো সেবার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে চায়। অবশ্য যখন তাদের তা প্রয়োজন বোধ হয়। সুতরাং একক বা ইউনিট্সগুলোর আগমন হয় এলোপাথাড়ি ভাবে। আবার এও দেখা যায়, একক বা ইউনিটসের কয়েকটি সমষ্টি বা বর্গ বা দলরূপে এসে সার্ভিস পয়েণ্টে আগমন করে। যেমন জনসাধারণ জনগোষ্ঠীরূপে বা জনসমষ্টিরূপে বাসষ্টপে এসে হাজির হয়। অথবা একদল লোক সিনেমাহলে টিকেট পাবার আশায় আসতে দেখা যায়। সমষ্টিগতভাবে লোক সংখ্যার আকার এসব ক্ষেত্রে একই রকম বা স্থির নয়। যাকে ইংরাজীতে বলা যায় Constant বা Stable নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তথ্য পরিসেবার কাজের সময় একইরকম হবে না, অথবা পূর্বে স্থিরীকৃত সেবা দেবার সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে একীকরণ সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, অনিশ্চিতের মধ্যে সেবাদেবার সময় (Service time) এবং পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের সময় (arrival time) আমরা বর্গের কিউইং সমস্যা সমাধানের সহজ অনুকূল পরিবেশ পাইনা। বিশেষতঃ trial এবং error পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ পরীক্ষা এবং ভ্রমাত্মক নীতির মাধ্যমে এ ধরণের কিউ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হই না। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের প্রয়োগ কৌশল আমাদের কাজের সহায়ক হতে পারে। এই প্রয়োগ কৌশলকে সম্মিলিতভাবে বলে থাকি অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ প্রক্রিয়া বা কিউ টেক্নিক বা কিউ মডেল। শুধুমাত্র সেবা পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের সময় এবং সেবার সময়ে আমাদের অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ বা কিউয়িং মডেল গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে, তা নয়। সেই সঙ্গে আরো কিছু Parameter বা বিচার্য বিশেষের ধ্রুবকের উপরও এব্যাপারে দায়িত্ব এসে পড়ে। এবং এর জন্যই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরণের কিউয়িং টেক্নিক।

যে কোন আঙ্কিক প্রতিরূপ (Mathematical model) প্রস্তুতে কিছু Parameter বা বিচার্য বিশেষের ধ্রুবক থাকে। যিনি তথ্য বিষয়ের কিউইং মডেল প্রস্তুত করবেন, তাকে আগে অন্তর্নিহিত যে Parameter বা ধ্রুবক রয়েছে তার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে। এই Parameter গুলোকে বলা হয় কিউয়িং সমস্যার বিভিন্ন ধরণের

উপাদান বা মূল সূত্র। এখন এই বিভিন্ন Parameter সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে কিন্তু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব।

সেবা পাবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত একক বা ইউনিটগুলো হাজির হয়েছে তাদের প্রচলিত ভাবে বলা হয়, খরিদ্দার। খরিদ্দার বললেই আমরা যাত্রী সাধারণ, রুগী, পাঠক, যন্ত্র, প্লেন, জাহাজ ইত্যাদিকে বুঝি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোন ইউনিট সেবা প্রত্যাশী হলেই আমরা তাকে খরিদ্দার বা Customer বলে থাকি। স্বাভাবিকভাবেই Cnstomer বা খরিদ্দার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় কিছু সহিষ্ণু ও কিছু অসহিষ্ণু খরিদ্দার। অসহিষ্ণু খরিদ্দার অনির্দিষ্ট কালের অন্য কিউএ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না বরং সে সেবা না নিয়েই চলে যাবে। কিন্তু সহিষ্ণু খরিদ্দার যতই অপেক্ষমান ভাবে থাকুক না কেন সে সেবা না নিয়ে স্থানত্যাগ করবে না। এখন দেখতে হবে, কার্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন খরিদ্দার নামধারী লোকজনের আকৃতি বা সংখ্যা কত। তা সে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টই হোক না কেন তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণভাবে কিউ পদ্ধতিতে সার্ভিস পাবার জন্য আগমনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে সেবা পাবার উদ্দেশ্যে এই আগমনের সময়কে এমন ভাবে বিতরণ করতে হবে, যাতে সেবামূলক ডাটা খরিদ্দারের আগমনের সময় সংখ্যাতাত্ত্বিক টেকনিকের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হয়। এই আগমনের প্রক্রিয়াকে সাধারণত আগমণনীতির বিস্তৃতিকরণ বলা হয়। কিন্তু এই সেবার উদ্দেশ্যে আগত খরিদ্দারদের আগমন সব সময় জ্ঞাতসারে হয় না। এ অবস্থায় আমাদের বিচার করতে হবে যে, সাধারণভাবে আগমণের নীতির প্রতিরূপ কেমন হয়ে থাকে। সংখ্যাতাত্ত্বিক গড়পড়তা হিসাবে কত একক বা ইউনিট সময়ের মধ্যে কতজন সেবা পাবার প্রত্যাশী প্রত্যাশা নিয়ে কিউ পদ্ধতির সাহায্যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। আমরাও জানি সভ্যজগতে সেবা নেবার জন্য কিউয়িং পদ্ধতি অপরিহার্য। সেবা পাওয়া এবং সেবা নেবার প্রক্রিয়া অবিরাম (Random)। এক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি পূর্বেই সব সময় বলা সম্ভব নয়। কিউএর বিস্তৃতি ঘটিয়ে সেবামূলক কাজে আমরা সময় কতটা বাঁচাতে পারি? গড়পড়তা তথ্যমূলক সেবার বিস্তৃতি আমাদের গড়পড়তা প্রতি ইউনিটকে

কতটা গতি সম্পন্ন করতে হবে, তা আমাদের অবহিত করবে কিউয়িং পদ্ধতি। প্রতি ইউনিট সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক কাস্টমারকে তথ্যমূলক সেবা দিতে পেরেছি তার মধ্যেই কিউ পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করেছে। স্বাভাবিক ভাবে এই লেনদেন ব্যবস্থায় আগমনের গতি এবং সেবা দেবার গতি—এই দুইএর মাঝামাঝি নূতন ইউনিটের আগমনের গতি এবং সর্বোপরি সেবা পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের গতি, সেবার প্রয়োজনের গতি, তদোপরি মাঝামাঝি সময়ের সেবা পাবার উদ্দেশ্যে আগত ইউনিটের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কিউ মডেল বা প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়। সেবামূলক কাজে বিভিন্ন স্তর 'বিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকে কিউ সমস্যার বীজ। ধরা যাক উৎপাদন প্রক্রিয়া। কোন ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আমরা বিভিন্ন স্তর দেখতে পাই। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তবে উৎপাদিত দ্রব্যটি আমাদের কাছে আসে। একে বলা হয় সিরিয়াল সেবা (**Serial Service**)। কোন একক বা **unit** এর আগমনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর অতিক্রমণ দেখা যায়। একটি কিউ প্রতিরূপ বা মডেল সৃষ্টির মধ্যে একাধিক সুযোগ সুবিধা দেবার সংস্থান থাকে। সে ক্ষেত্রে একাধিক একক বা **unit** একটি কিউ মডেলের সাহায্যে বিভিন্ন সেবা পেতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় সমতুল্য (**Parallel service**) সেবার প্রতিরূপ।

সেবার নিমিত্ত একক সমূহের আগমনের বিভক্তিকরণের কাজ এবং সেবার বণ্টন কার্যাদির স্থিরীকরণের পর আমাদের দেখতে হবে খরিদ্দারের স্বার্থে কি ধরণের সেবামূলক কাজ বা কিউ ডিসিপ্লিন (**Queue discipline**) হাতে নেওয়া হয়েছে। সেবা দেবার পদ্ধতি কেমন হতে চলেছে তাও আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। একথা সর্বজন বিদিত যে যে প্রথম যিনি বা যে একক সেবা নিতে আসেন তাকে প্রথম সাহায্য দেবার নীতি আমাদের মেনে নেওয়া একান্ত কর্তব্য। ইংরাজীতে যাকে বলে **First come first served**-এর নিয়ম। কিন্তু অবস্থা বিশেষে এই নিয়ম সর্বদা পালিত হয় না। ধরা যাক কোন মেশিন খারাপ হয়ে গেল তখন সেটি সারানোর কাজ প্রয়োজন অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করতে হয়। তখন প্রয়োজন অনুসারে কিউ ভেঙ্গে দিয়েও মেশিনটির মেরামতি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়। তেমনি তথ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ

লোক তা সে সরকারী বা বেসরকারীই হোক না কেন প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী কিউকে উপেক্ষা করেও তার সেবা আমাদের করতে হয়। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য ব্যবহারকারীকে তথ্য দেবার কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়। কোন হাসপাতালে যেমন অপেক্ষমান রুগী থাকা সত্ত্বেও যদি অধিকতর দুরারোগ্য কোন রুগী এসে হাজির হয় তবে সে সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে এবং এক্ষেত্রে কিউকে উপেক্ষা করেও সর্বাগ্রে তাকে চিকিৎসার সুযোগ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সুতরাং সর্বাগ্রে সেবা পাবার অধিকারী রূপে গড়ে তোলে নূতন এক ধরণের সার্ভিস বা সেবার ইউনিট বা একক। তাহলে এও এক ধরণের কিউইং পদ্ধতি যাকে আমরা ইংরাজীতে বলতে পারি "**Last come first served**" নিয়ম। এটাও কিন্তু অবিরাম সেবা প্রক্রিয়া। প্রাথমিক কিউকে ভেঙ্গে নূতন কিউ সৃষ্টি করে। এই যারা পরে এসে সেবা পাবার অধিকারী হচ্ছে তারাও আবার সময়ের গতি অনুযায়ী নূতন একটি করে কিউ অবিরাম তৈরী করছে বা **Random** কিউ গঠিত হচ্ছে। অতএব কিউ ডিসিপ্লিন হচ্ছে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একটি কিউ প্রতিরূপ বা মডেল প্রস্তুত করবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুযোগ সুবিধা বিস্তারের নক্সা প্রস্তুতকালে অপেক্ষমানতার মূল্য এবং সেবার মূল্যের (**Cost of Waiting** এবং **cost of service**) সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে সেবা দেবার উপকারিতাকে স্পষ্ট করে বোঝা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, একটি কিউ মডেল প্রস্তুতের পূর্বে কিউএর বিভিন্ন উপাদানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে—(১) খরিদ্দারের সংখ্যা বা **customer population** (২) কোন ধরণের খরিদ্দার বা **customer** (৩) আগত এককগুলোর বন্টন ব্যবস্থা (৪) কত সংখ্যক সেবা পাবার সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান রয়েছে। (৫) কিউ ডিসিপ্লিন (৬) অপেক্ষমানতার মূল্য এবং সেবার মূল্য।

আমরা এখন সংক্ষেপে দুএকটি কিউ মডেল নিয়ে আলোচনা করব। ডেভিড কেন্ডেল (**David Kendall**) কিউ তত্ত্বকে উন্নত পর্যায়ে ব্যবহার করবার জন্য সংক্ষিপ্ত চিহ্নের প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এর আকৃতি হচ্ছে **A/B/C/K/M/Z.** এখানে **A** দুটি একক বা ইউনিটের আগমনের

মধ্যবর্তী সময়ে যে বণ্টন ক্রিয়া সংগঠিত হয় তার প্রতীক। B হচ্ছে সেবা বণ্টনের প্রক্রিয়ার প্রতীক। C হচ্ছে সেবকের সংখ্যার প্রতীক। K হচ্ছে সিস্টেমস্ বা পদ্ধতির সাহায্যে সেবা দেবার ক্ষমতা অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কত সংখ্যক খরিদ্দার বা customer কে ধারণ করবার ক্ষমতা রয়েছে। কত সংখ্যক সূত্র বা উৎপত্তিস্থল এ পদ্ধতিতে রয়েছে তা দেখবার জন্য M চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। Z ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কিউ তত্ত্বটিকে বা discipline কে বোঝানো হয়েছে। সাধারণত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চিহ্ন A/B/C কে বোঝানো হয়েছে যে কিউএর আয়তনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। খরিদ্দারের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অসীম। কিউ তত্ত্বটি বা discipline টিকে বলা যেতে পারে FCFS.

ঐতিহ্যগতভাবে A এবং Bর জন্য যে সমস্ত চিহ্ন (Symbol) ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ—

GI সাধারণ স্বাধীন দুটি আগমনের মধ্যবর্তী সময় নির্ধারিণ।

G সাধারণ সেবার সময়ের বণ্টন ব্যবস্থা।

K দুটি এককের আগমনের মধ্যবর্তী অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন স্তর বা সুষ্ঠু সেবা বণ্টনের প্রক্রিয়া।

EK এই চিহ্নের মাধ্যমে সার্ভিস বা সেবার বণ্টন ব্যবস্থা বোঝায়, বা দুটি আগমণের মধ্যবর্তী সেবা ব্যবস্থা।

M এই নোটেশনটিও সেবা বণ্টনের প্রক্রিয়া বিশেষ।

D ক্রমাগত একাধিক আগমন স্থিরীকরণ এবং এগুলোর সুষ্ঠু বণ্টন এই D চিহ্নের মাধ্যমেও করা যেতে পারে।

এখন দেখা যাক অন্য এক ধরণের কিউ মডেল প্রস্তুতি করণে আমরা কেমন করে এগিয়ে চলি।

১। M/M/1=ক্ষতিকারক আগমণ, ক্রমবর্ধমান সেবার সময়ের বণ্টন এবং একক সেবা, যাকে আমরা ইংরাজীতে 'First come First served queue discipline' বলি (এটি হচ্ছে বিশেষ একটি ক্ষেত্র যা হয়ে ওঠে M/G/1, G1/M/1)।

২। M/M/C র বিভক্তিকরণ আমরা উপরিউক্ত উপায়ে করে থাকি, যেমন ক্ষতিকারক আগমণ (Poison Arrival) ক্রমবর্দ্ধমান সেবার সময়ের বণ্টন ব্যবস্থা (Exponential service time distribution), C হচ্ছে

সেবকবৃন্দের (servers) প্রতীক। মোটকথা, FCFS হচ্ছে কিউইং এর প্রাণশক্তি।

৩। M/M/C/C—M/M/C হচ্ছে হারিয়ে যাবার পদ্ধতি (Loss System)।

এই পদ্ধতিকে M/M/C/C হারিয়ে যাবার পদ্ধতি বলা হয়, কারণ এমন অনেক সময় খরিদ্দাররা এসে হাজির হয়, যখন সেবকবৃন্দ অন্য কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে এবং খরিদ্দারকে অপেক্ষা করার অপ্রয়োজনীয়তা জানিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং সেবা পাবার মানসে আগত খরিদ্দাররা বঞ্চিত হয়।

৪। প্রকৃত জীবনের প্রয়োজনে কোন কিউইং পদ্ধতিরই অসীম সংখ্যক সেবক থাকা সম্ভব নয়। এখানে বলা যায় যে, সাধারণত একজন সেবক প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকে নবাগত কোন খরিদ্দারকে সেবা দেবার জন্য।

৫। **M/M/I/K/K** (একজন রিপেয়ারম্যানের সাহায্যে মেশিন সারানোর প্রক্রিয়া—**Machine repair with one repairman**)

উপরিউক্ত এই মডেলটি হচ্ছে একটি সীমিত সূত্র (Source) মডেল যার মধ্যে রয়েছে K রূপী খরিদ্দার। এটিকে Machine repair model, the machine interference model অথবা আর একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায়, cyclic queue model. কিউইং তত্ত্বগত মডেল গুলোর মধ্যে এই উল্লিখিত মডেলটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মডেল বলে মনে হয়।

৬। M/M/C/K/K (Machine repair, multiple repairmen)

উদাহরণ রূপে বলা যায়—

দুজন খরিদ্দার বা Customer

↓ ইঞ্জিনীয়ারিং টিম

সেবকবৃন্দ

। ৮ কমপিউটার সিসটেম

↓

খরিদ্দার বা Customer

৭। M/M/। অগ্রাধিকারী কিউইং সিসটেম

↓

↓ ↓

অগ্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় (Primitive priority discipline) অগ্রে সর্বাধিক বিষয় নয় (Non Primitive priority discipline)

উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখি যে অনলাইন অনুসন্ধান সিসটেমের মধ্যে

দুরকমের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া রয়েছে। টাইপকে সবসময় টাইপ ২ এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সঠিক কিউইং মডেল সঠিক সময়ে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে অনেক সমস্যা, তাদের মূল্যায়ণ, সমাধান এবং কোন কিছুর স্থিরীকরণ, ভেরিয়েবল বা পরিবর্ত্তনীয় বিষয় আমরা সহজেই লাভ করতে পারি। বস্তুতঃ গড়পড়তা হিসাবে অপেক্ষমান সময়ের সঙ্গে গড়পড়তা আগমনের সময় সঠিকভাবে ব্যয়িত হয় এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। কিউ এর দৈর্ঘ্য, গড়পড়তা সারির দৈর্ঘ্য এবং তথ্য পাবার উদ্দেশ্যে আগমনের সম্ভাবনার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে হবে। কোন কিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থিরীকৃত এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যা কিউইং পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল করে চালানো সম্ভব। বিভিন্ন ভেরিয়েবল বা পরিবর্ত্তনীয় বিষয় ব্যবহার করে সেবা দেবার অনুকূল পরিস্থিতির মাধ্যমে নক্সা প্রস্তুত করে সেবার কাজকে প্রসারিত করা সম্ভব। কিউ আয়তন এবং সারির আয়তনকে সম্ভাব্য বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাফল্য মন্ডিত করে তথ্য আহরণ এবং বণ্টন দুটোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাও সম্ভব করে দিয়েছে এই কিউ পদ্ধতি।

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে queueing পদ্ধতি বা তত্ত্ব ব্যবহার করে আজ Operation Research এর কাজ যে কত সহজতর করে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে Operation Reasearch কথাটি বহুল প্রচারিত। কিউইং পদ্ধতি আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের কাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থাকে গতিময় করে দিয়েছে। আগামী সংস্করণে কিউ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করবার আশা রাখি। কিউইং পদ্ধতির এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আগামী দিনে তথ্য বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করবেন—এ আশা আমাদের আছে। এতে কাজের পরিবেশের মধ্যে একটা গতিময়তা এসে যাবে।

মোটকথা তথ্য পরিচালনা ব্যবস্থায় এই কিউইং তত্ত্ব কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারি, তাতেই এই আলোচনার সার্থকতা।

References

1. Bhandiwad, R. & Williams, A. C.—"Queueing Network Models of Computer systems". Third Texas Conference on Computing systems, Nov. 1974.

2. Burke, P. J.—"Output of a queueing systems" Operations Research, vol. 4, PP. 699-704.

3. Buzen, J. P.—"A queueing Net work Mcdel of MVS" ACM Computing Surveys, Sept. 1978.

4. Kleinrock, L.—"Queueing Systems" Vol 1 : Theory, John Wiley & sons. N. Y.

5. Kobayashi, H.—"Applications of the diffusion Approximation to queuing networks (two parts)" JACM, Vol-21.

6. Lam, S.—"Queueing Networks with population size coustraim". I B M Journal of Research & Development. 1977.

7. Reiser, M & Saner, C. H.—"Queuing Networks with Multiple closed chains : Theory and Computational Algorithms". IBM Journal of Research and Development, 1975.

8. Williams, A.C. and Bhandiwad, A.—"A Generating function approach to Qeueueing Net work Analysis of multi-programmed Computers", Net works 6, 1—22.

9. Trivedi, K. S.—"Probability and Statistics with relativity, queueing and computer science applications." 1988 (PP. 411—467)

10. Rajeswari A.R.—"Queueing model", (Paper submitted in the workshop on Computer techniques in information processing, March 3—8, 1980) at the Dept. of Lib. Sc. University of Delhi.

বিংশ অধ্যায়

তথ্যবিজ্ঞানের টুকিটাকি

(ক) **ডাটাবেসের গঠনের উপাদান ঃ**

(১) তথ্যপঞ্জী বিষয়ক (**Bibliographical**)

(২) সংখ্যাতত্ত্বমূলক (**Statistical**)

(৩) ডাইরেক্টরী (**Directory**)

(৪) পরিপূর্ণ পাঠ্য বিষয় (**Full text**)

(৫) হিসাব নিরূপণ প্রক্রিয়া (**Calculation**)

(খ) **কয়েকটি অনলাইন সিসটেমের নাম ঃ**

(১) ডায়েলগ (**Dialog**),
এস. ডি, সি, (**SDC**) অরবিট (**Orbit**)

(২) পারগামন ইনফোলাইন (**Pergaman Infoline, U. S. A**).

(৩) কোয়েস্টাল (**Questal**), ফ্রান্স।

(৪) ইমপেক্ (**Impec**), জার্মানী।

(৫) আই, আর, এস—ই, এস, এইচ.
(**IRS/ESH**) ইতালী।

(গ) **ডায়েলগ** (Dialog) **সার্ভিস দেবার পদ্ধতি ঃ**

ডায়েলগ সার্ভিস নিতে হলে টেলিকমিউনিকেশনের সাহায্য নিতে হবে।

(১) প্যাকেট সুইচ্ড্ নেটওয়ার্ক (**Packet Switched Data Network**)।

(২) পাবলিক সুইচ্ড্ টেলিফোন নেটওয়ার্ক
(**Public Switched telephone network**)

(৩) লিস্‌ড লাইন (**Leased line**)

(৪) টেলেক্স (**Telex**) ইত্যাদি

(ঘ) **কমপিউটার পদ্ধতির সুবিধা ঃ**

(১) দ্রুতকার্য সম্পাদন (২) ব্যাপক ব্যবস্থা (৩) হাল সময়ের তথ্যাদি

সংগ্রহ (৪) শক্তিশালী মাধ্যম (৫) পরস্পর নির্ভরশীল কার্যক্রম (৬) সহজ সাধ্য (৭) অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধা (৮) তথ্য দ্রুত ব্যবহারকারীর নিকট পেঁছে দেয় (৯) উন্নত ধরণের তথ্য দ্রুততার সঙ্গে এবং যোগ্যতার সঙ্গে স্থানান্তরণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম।

(ঙ) **কয়েকটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া :**

(১) কারেন্ট এ্যাওয়ারনেস সার্ভিস (**current awareness service**)।

(২) এস. ডি. আই. (**SDI**) বা **Selective Dissemination of Information Service.**

উপরিউক্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই অতীত সম্পর্কে অনুচিন্তাশীলতার (Retrospective) সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। কারেন্ট এ্যাওয়ারনেস তথ্য প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই : দ্য ষ্টেট অব দ্য আর্ট সার্চেস (**The State of the art searches**) গতানুগতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেও অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাওয়া। দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অনুসন্ধান এবং উদ্ভাবক ও এ্যাসাইনেল (**Inventor and assignal**) অনুসন্ধান ইত্যাদি।

(চ) **অনলাইন সিস্টেমের মূল নীতি :** এই নীতিতে লক্ষ লক্ষ তথ্য তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে বা তড়িৎ গতিতে তথ্যাপিপাসু মানুষের কাছে পেঁছে দেওয়া সম্ভব। অন্যভাবে জরুরী ভিত্তিতে লক্ষ লক্ষ ইনফরমেশন বা তথ্য উপরিউক্ত নীতিকে অবলম্বন করে তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট পেঁছে দেওয়া বাস্তবে সম্ভব, ইংরাজীতে একে বলা হয়, **"Instant access to millions of items of information".**

(ছ) **অনলাইন সিস্টেম এজেন্সীগুলোর কয়েকটি নাম :—**

(১) ডাটাবেস প্রডিউসার (**Database Producer**)।

(২) ডাটাবেস ভেন্ডার, যেমন ডায়েলগ (**Dialog**)।

(৩) টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক : ডোমেষ্টিক এন্ড ইন্টার ন্যাশানাল যথা টেলিফোন / ডাটা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক যা, আবার আন্তর্জাতিক উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তথ্য নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

(জ) **ইন্ডোনেট (Indonet) কথাটি সম্পর্কে ধারণা**

ভারতের প্রথম ডোমেষ্টিক ডাটার নামই ইন্ডোনেট।

(ঝ) **বায়োটেক্নোলজি ঃ** জীব বিজ্ঞানকে, বিশেষতঃ জেনেটিক্‌স্ (Genetics) কে যখন প্রযুক্তিবিদ্যায় অথবা শিল্পে ব্যবহার্য করে তোলা যায়, তখন তাকে বায়োটেক্‌নোলজি বলা হয় যা ভারতে ঔষধ শিল্পে, কৃষি ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য শিল্পে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা বায়োটেক্‌নোলজি বিশেষতঃ জেনেটিক্‌সের বিদ্যায় চরম সাফল্য লাভ করেছেন।

(ঞ) **NBTB সম্পর্কে ধারণা ঃ** জাতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা বোর্ডের (National Biotechnology Board) লক্ষ্য হচ্ছে জীব প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি।

(ট) **এ্যানালগ কমপিউটার ও ডিজিটাল কমপিউটারের পার্থক্য ঃ** যে কমপিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য প্রয়োগ করে তথ্য পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় অনুরূপ কমপিউটার (Analogue Computer)। আবার যে কমপিউটার ডিজিট বা সংখ্যাকে অবলম্বন করে কাজ করে তাকে বলা হয় ডিজিটাল কমপিউটার (Digital Computer)।

(ঠ) **ডাটা বেস ও ডাটা ব্যাঙ্কের পার্থক্য ঃ** যদি তথ্য শুধুমাত্র তথ্য পঞ্জীকৃত ভাবে কমপিউটারে সঞ্চিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় ডাটা বেস (Data Base)। অপরদিকে, যদি তথ্য তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র রক্ষা করে বিষয়ীভূত হয়ে কমপিউটারে সঞ্চিত হয়, তখন তাকে বলা হয় ডাটা ব্যাংক (Data Bank)। ইংরাজীতে বলা যায়, Data Base is bibliographic in approach and Data Bank is substantive or non bibliographic in approach.

(ড) **মডেম** (Modem) ঃ এই যন্ত্রটি কমপিউটারের ডিজিটাল (স্পন্দন) থেকে এ্যানালগ তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। কমপিউটারের সঙ্গে মডেম লাগালে তা কমপিউটারের তথ্য সাধারণ টেলিফোন লাইনের সাহায্যে যেখানে পাঠাবার ইচ্ছে সেখানে পাঠানো সম্ভব।

(ঢ) **কমপিউটারের ভাষা ঃ** (১) বেসিক (Basic Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) ঃ এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় মাইক্রো কমপিউটার প্রোগ্রামিং হাইলেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ।

(২) কবল ঃ (Cobol—Common Business Oriented language) কমন বিজ্‌নেস্ ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ। এটি ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা

সমাধানের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হাইলেভেল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা। এ ভাষার সংকেতের চেয়ে সাধারণ ইংরাজী শব্দের ব্যবহার বেশী। তাই যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং আগে জানেন না, তারাও এর অর্থ বুঝতে সক্ষম।

(৩) **পাসকেল** (Pascal) ঃ হাইলেভেল প্রোগ্রামিং এর ভাষা। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ বেইজ পাসকেলের নাম অনুসারে এর নামাকরণ করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের নিকোলাস রিথ এই ভাষা তৈরী করেন। এই ভাষা **FORTRAN** থেকে সহজ এবং **BASIC** থেকে শক্তিশালী। এটি মিনি কম্পিউটারে বেশী প্রয়োগ করা হয়।

এভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য কম্পিউটারে বিভিন্ন হাইলেভেল কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়।

(ণ) **পদার্থ বিজ্ঞানে আজকের সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণার নাম—সুপার কন্‌ডাক্‌টিভিটি** (**Super Conductivity research**) ঃ এতে দেখানো হয়েছে ইলেকট্রিক কারেণ্টের গতি স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব।

(ত) **আধুনিক বিশ্বে ভয়াবহ রোগটির নাম এইডস** (Aids)।

(থ) **মেটিরিয়েল গবেষণা** (**Material Research**) ঃ এই গবেষণার মাধ্যমে নূতন বস্তুকে আবিষ্কার করে তার প্রপার্টির (**Property**) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে, তাকে বিজ্ঞানের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পের গবেষণাতে কাজে লাগাতে হয়। এর আরেকটি কাজ হচ্ছে নূতন প্রযুক্তি বিদ্যার উদ্ভাবন।

(দ) **তথ্য বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি দিক** ঃ

(১) INSPEC—Information Science for Physics and Engineering.

(২) ডাটা সিসটেম (**Data System**)—সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশনের একটি রেজিষ্টার প্রস্তুতিকরণ, যাতে যে কোন প্রকাশনার হদিশ অতি সহজেই পাওয়া যায়। ডাটা সিষ্টেম প্রয়োগ করে যে কোন বিষয়ে পঞ্জীকৃত তথ্য সণাক্তকরণ সহজতর হয়ে উঠতে পারে। বর্গী-করণের সঠিক মান নির্ধারণ সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন সিষ্টেমের মধ্যে মানকের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে পরিচালনা করা সম্ভব।

(৩) **ISDS** ঃ International Serial Data System

(৪) **ASCS** ঃ Automatic Science Citation

(৫) UNISIST : World Science International System (1971)

UNISIST এর লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য পরিবহনের সহায়ক পদ্ধতিগুলোর এমন ভাবে উন্নতি বিধান করা যাতে সম্পর্কযুক্ত বিষয় গুলোকে এক সূত্রে বেঁধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

তথ্য মূলক চেন (Chain) টিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে গবেষণাগার এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মধ্যে UNISIST এর সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে সহায়তা দান UNISIST এর একটি প্রধান লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা যাতে সুষমভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে সেটিও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি উন্নতিশীল দেশ গুলোতে বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান এবং এসব তথ্য দেবার একটি Infrastructure প্রস্তুত করে দেওয়াও UNISIST এর লক্ষ্য।

(৬) SRC : Standard Reference Code.

(৭) UNIDO : United Nations Industrial Development Organisation.

(৮) UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.

(৯) আই. এন. এস. পেক (INSPEC) : ইনফরমেশন সায়েন্স ফর ফিজিক্স এ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কমিউনিকেশন (Information Science for Physics and Engineering Communication)।

(১০) NISSAT : প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের যাতে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে, National Committee of Scicnce and Technology, সংক্ষেপে NCST এবং CSIR—এই দুটি সংস্থা আমাদের দেশের উপযোগী তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এদেরই চেষ্টায় UNESCO প্রতিনিধি Peter Lazar ভারতের বর্তমান সুযোগ সুবিধা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার পর একটি জাতীয় তথ্য পরিকল্পনার জন্ম হয়। একেই NISSAT অথবা National Information System in Science and Technology বলে। ১৯৭৭ সালে এই তথ্য পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে এবং এর প্রধান দায়িত্বে আছে, DST (Depertment of Sicence & Technology)।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের অভাব রয়েছে সে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা **NISSAT** কর্মসূচীর অন্তর্গত। **NISSAT** এর কাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে তথ্যসেবা ও পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ের কর্মকাণ্ডের নীতি নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। যারা নীতি নির্ধারণ করবেন এবং পরিচালনা করবেন, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে কারিগরী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তথ্য পরিসেবায় রেপ্রোগ্রাফী ও কমপিউটারের প্রয়োগের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করবার জন্য তথ্য পরিসেবার কাজকে আধুনিকতম করে তুলতে হবে। **Mission Oriented Research** এর জন্য একটি জাতীয় স্তরে **Network** প্রস্তুত করতে হবে। **NISSAT** এর গঠনের মধ্যে আমরা চারটি স্তর দেখতে পাই। যেমনঃ (১) জাতীয় তথ্যকেন্দ্র, (২) আঞ্চলিক তথ্যকেন্দ্র (৩) সেকটরেল তথ্যকেন্দ্র (৪) স্থানীয় তথ্যকেন্দ্র।

(ধ) **ডঃ আই. এন. সেনগুপ্তস ল অব বিবলিওমেট্রিক্স ঃ** একে বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত আবিষ্কৃত নূতন ধরণের তথ্য পরিমাপক ব্যবস্থা'। 'ডঃ সেনগুপ্ত যে নূতন সূত্রের আস্কিার করেছেন, তা দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলোর গ্রন্থপঞ্জী বিশ্লেষণে এক নব দিগন্ত খুলে গেছে। এই সূত্র অনুযায়ী তিনি প্রমাণ করেছেন যে কোন বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় তার প্রাথমিক বিকাশের সময় সেই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অধিকতরভাবে প্রকাশিত হয়। ডঃ সেনগুপ্তর এই সূত্রটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। গ্রন্থপঞ্জী বিশ্লেষণে এই নূতন সূত্র এই সংক্রান্ত ব্রাউন ও গ্রসের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি সংশোধনে সমর্থ'। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোর গুণানুসারে নামের এই তথ্য তালিকা তিনি প্রতি বিষয়ের পনের শত থেকে আঠারো শত তথ্য বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন। এই তালিকাগুলির প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা সেই বিষয়ের উপর সত্তর থেকে আশি শতাংশ তথ্য পরিবেশন করে। প্রতিটি জীবচিকিৎসা (Biomedical) প্রতিষ্ঠান এই তথ্য অনুসারে যদি তাদের ক্রয় তালিকা তৈরী করে তবে দরিদ্র ভারতের অসংখ্য বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ডঃ সেনগুপ্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজীতে এই সূত্রের মাধ্যমে ছয়শত পঞ্চাশটি বিজ্ঞান পত্রিকার মধ্যে চারশতটি পত্রিকা বাদ দিতে সমর্থ হয়েছেন। এরজন্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণার

কোনরূপ ক্ষতি হয়নি। বর্তমানে আড়াইশ পত্রিকার মূল্য প্রায় আঠারো লক্ষ টাকা। সুতরাং কত বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হয়, তা বলাই বাহুল্য।

তাঁর মতে যদি এভাবে সত্তর থেকে আশি শতাংশ তথ্য পাওয়া যায় তবে বাকি দুই থেকে তিন শতাংশ তথ্য আমরা আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ অথবা জেরক্স (Xerox) করে সংগ্রহ করতে পারি। তারজন্য বিশেষ বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই।

(ন) **কোন কোন লক্ষণের মধ্যে তথ্যে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে ঃ** তথ্যের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তথ্য সব সময় মৌলিক বা সৃজনমূলক হবে এবং তা এখনও বিস্তারিত হয়নি (**Undisseminated**)। সর্বোপরি তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। প্রাথমিক তথ্যমূলক নথির অন্তর্ভুক্ত হোলো, প্রথমতঃ জার্নাল, রিপোর্ট, কনফারেন্স রিপোর্ট, সোসাইটি রিপোর্ট, পেটেন্টস্, ষ্টানডার্ডস, থিসিস। মাধ্যমিক তথ্যমূলক নথি হচ্ছে—সারসংক্ষেপ, নির্দ্দেশক, অভিধান, কোষগ্রন্থ, হ্যাণ্ডবুক, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি।

(প) **কো-ডাটা সেন্টারের তিনটি লেভেল বা স্তর** (**Co-data centres at levels**) :

(১) ডাটা ইভ্যালুয়েশন সেণ্টার (**Data evaluation Centre**)।

(২) ডাটা বিস্তারিত করার কেন্দ্র (**Data Dissemination Centre**)।

(৩) ডাটা রেফারেন্স পদ্ধতি (**Data Reference System**)।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো ডাটা কমিটির নাম ঃ

(১) কো-ডাটা জেনি—কমিটি ফর জেনেটিক্স
(**Co-data—Committee for Genetics**)

(২) কো-স্পা-র (**Co-spa-R—" Space**)।

(৩) স্কার (**Scar**)— **Scientific committe for Atlantic Research.**

(৪) স্কোর (**Scor**)—**Scientific committee for Oceanic Research.**

(ফ) (১) **অদৃশ্য কলেজ** (**Invisible college**)—কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু তাদের গবেষণার বিষয়ে একের সঙ্গে অপরের মেইলিং (**Mailing**) এর মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এভাবেই তারা নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করে চলেছেন। এই

তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়াকে আমরা Invisible College বলে থাকি। এর মাধ্যমে তথ্য আহরণ হয়।

(২) **ইনফরমেটিক্স্** (Informatics): Information Science কথাটির জন্ম আমেরিকায় এবং এই শব্দটির ব্যবহার ষাটের দশকে সেখানে খুব বেশী হতে থাকে। রাশিয়ায় এই শব্দটির উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ফলে রাশিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট মিখাইলভ গিলজারভেস্কি ও চেনির উদ্যোগে নূতন নাম হিসাবে তারা Information science এর পরিবর্ত্তে ইনফরমেটিক্স্ (Informatics) শব্দটির স্বীকৃতি দিলেন। মিখাইলভ ও গিলজারভেস্কির একটি বই FID স্বীকৃতি দিল প্রকাশনার মাধ্যমে। তার নাম দেওয়া হল—**An Introductory Course on Documentation/Informatics.** এভাবে আমরা দেখলাম Information Science কথাটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হতে থাকল।

(ব) **AACR—দ্বিতীয় সংস্করণ:**

(১) **AACR** (দ্বিতীয়) এর লক্ষ্য ও নীতি: সমস্ত উত্তর আমেরিকার ও গ্রেটবৃটেনের পাঠ্যবস্তুর তালিকা প্রস্তুতকরণের ব্যবস্থা এতে রয়েছে, যা আমরা ১৯৬৭ সালের কোডে পেয়েছি।

(২) পূর্বে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংযোজন করতে চাওয়া হয়েছিল, সে দিকে লক্ষ্য রেখে AACR এর নিয়মাবলী করা হয়েছে।

(২) সংশোধনের জন্য নূতন যে সকল প্রস্তাব এসেছে বা পুরানো টেক্সটে এসেছিল, সেগুলো শুধু যে তিনটি এ্যাংলো আমেরিকান দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে, তাই নয়, অন্যান্য যে সকল দেশে এই কোড প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানকার সুবিধা অসুবিধার কথাও চিন্তা করা হয়েছে।

(৪) AACR (দ্বিতীয়) এর গঠনমূলক বৈশিষ্ঠ্য (Salient features) হচ্ছে এই কোডের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি সংগঠনশীলতা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রে বা গ্রন্থাগারের সমস্ত ধরণের উপাদান সমূহকে নিয়ে কাজ করতে কোন অসুবিধা হয় না, ইংরাজীতে যাকে বলে Concurrent Rule. উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন (Punctuation Mark) ব্যবহারের সংস্থান রাখায় এই কোড মার্ক প্রকল্পের কাজকে খুবই সহজসাধ্য করে দিয়েছে। গবেষণাগারের গ্রন্থাগারগুলোর কাজের ক্ষেত্রে এই AACR (২) কোড খুবই সহায়ক হয়েছে এবং I S B D সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকায় তথ্য

সংগঠিত করার কাজকে ত্বরান্বিত করেছে অর্থাৎ **International Standard Bibliographic Descriptors (General)** ব্যবহার করে এই কোডটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এই কোডে বর্ণনাত্মক অংশ ও আখ্যায়িকাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার সংস্থান রয়েছে এবং **Corporate Authorship Entry** কে উন্নতমানের করা হয়েছে। AACR (২) তে প্রখ্যাত তথ্যবিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ যেখানে বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। তালিকায় **Entry**গুলো করার সময় তথ্যের প্রধান সূত্রের অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই ডঃ রঙ্গনাথনের **Principle of the ascertainability**র প্রয়োগ। প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য করে AACR (২) কোডটি প্রস্তুত করার চেষ্টা হয়েছে।

(৫) AACR (২) এর গঠন ঃ

(১) প্রত্যেক Chapter Number দেবার সময় Gap দেওয়া হয়েছে। নিয়মাবলী গঠন করার সময় দেখা হয়েছে যাতে সেগুলোকে স্মৃতিতে রাখা যায়। **Punctuation Mark** ইত্যাদির সংস্থান মারফৎ আটটি বর্ণনাত্মক বিভাগ রয়েছে।

১/১ Title and Statement of responsibility.

১/২ সংস্করণ (Edition)।

১/৩ প্রকাশন (Publication)।

১/৪ উপাদান—কোন ধরণের প্রকাশন (**Specific details Distribution**)।

১/৫ দৈহিক বর্ণনা—(**Physical Description**)।

১/৬ সিরিজ (**Series**)।

১/৭ নোট।

১/৮ Standard Number and Terms of availability.

যা হোক AACR (২) তে তিনধরণের বর্ণনা দেখতে পাই। প্রথমতঃ ষ্টাইল (Style) ও বানান (Spelling)। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে প্রয়োজনে alternative rule ক্যাটালগে বা তালিকায় ব্যবহারের স্বাধীনতা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এ স্বাধীনতা দেখা যায় entry প্রস্তুতকালে সঠিক নিয়ম ব্যবহারে এবং entry গুলো করার সময়।

(ভ) **ইউনেস্কো** (UNESCO)—United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation এর সংক্ষিপ্তরূপ রাষ্ট্রসংঘের সংবিধানের ৫৭ ধারা অনুযায়ী এটি গঠিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এই সংস্থার জন্ম হয়েছে। একথা মনে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গঠিত International Institute of Intellectual Cooperation UNESCOর পূর্বসূরী। এ সংস্তার প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথমতঃ ইউনেসকো সবরাষ্ট্রে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের উৎসাহ দানের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ সদস্যরাষ্ট্রে বিশেষ করে সদ্য-স্বাধীন এবং উন্নতিশীল দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে তাদের উন্নতিবিধান করে। তৃতীয়তঃ শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে documentation প্রসারের জন্য বিতরণ কেন্দ্র (Clearing house) হিসাবে কাজ করে।

(ম) **এফ. আই. ডি** (FID বা Federation Internationale de Documentation)—ফনটেন এবং অটনেটের উদ্দ্যোগে ১৮৯৫ সালের ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ব্রাসেল্সে একটি International Conference ডাকা হয়েছিল। এই conferenceএ জন্ম নিল Institute Internationale de Bibliography বা IIB. এরা আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করতে শুরু করল। বিষয়-ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করতে গিয়ে তাদের প্রয়োজন হল বর্গীকরণ পদ্ধতির। আমেরিকায় তখন Deweyর দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু Deweyর দশমিক পদ্ধতি কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হল। তাই দশমিক পদ্ধতিকে ভিত্তি করে নূতন পদ্ধতি চালু হল এবং এর নামকরণ হল Universal Decimal Classification. পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম UDC অবলম্বন করে এই সংস্থার কাজ পরিচালিত হত। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে IIB কে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৩১ সালে এই সংস্থার নূতন নামকরণ হয়েছিল Institute de International Documentation বা IID. এই নামের সঙ্গে সঙ্গে সাবেকী ধরণের গ্রন্থপঞ্জীর পথ ছেড়ে এখন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদির কাজ ডকুমেণ্টেশনের যুগে প্রবেশ করল। ১৯৩৮ সালে এই

I I Dর নাম পরিবর্তিত হয়ে হল Federation Internationale de Documentation (FID)। এবার জাতীয়স্তরের সদস্য সংস্থার সাহায্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূচনা হল।

FID র সাংগঠনিক কাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণসভা, ব্যুরো পরিষদ এবং সচিবালয়। FID র উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে তথ্য-বিজ্ঞানের সংস্থা ও ব্যক্তির কাজের সামঞ্জস্য বিধান করা। তথ্য বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রক্রিয়ার মূল্যায়ণ করা ও তার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে তথ্য নিয়ে অধ্যয়ন করা।

উন্নতিশীল দেশগুলোতে যাতে Documentation এর কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তা দেখা। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া এবং ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। সর্বশেষে একথা বলে শেষ করবো যে FID তে দুধরণের সদস্য আছে। যেমন পূর্ণসময়ের সদস্য এবং সহযোগী সদস্য।

তথ্য বিজ্ঞানের টুকিটাকি অধ্যায়টি শেষ করবার পূর্বে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় তথ্য কেন্দ্রের নাম করবো, যারা নিরলসভাবে তথ্য বিতরণ ও তথ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজ করে চলেছেন।

(য) ইনসডক (INSDOC), নিউদিল্লী।

(র) ডি. আর. টি. সি (DRTC), বাঙ্গালোর।

(ল) বার্ক (BARC বা Bhaba Atomic Research Centre), ট্রম্বে।

উপরিউক্ত তথ্য কেন্দ্রগুলোতে কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে এবং এরা সাফল্যও লাভ করেছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

ডকুমেণ্টেশনের কাজ ও সেবা : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায় তারা ডকুমেণ্টেশনের কাজ ও সেবাকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। বস্তুতঃ এদুটো ব্যাপারকে যদি আমরা আলাদা করে দেখি, তাহলে ডকুমেণ্টেশন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ রঙ্গনাথন ডকুমেণ্টেশন শব্দটি উপলব্ধি করেছেন কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে। যেমন, ডকুমেণ্টেশনের কাজ হচ্ছে সঠিক তথ্যপঞ্জী প্রক্রিয়া এবং ডকুমেণ্টেশনের সেবা হচ্ছে তথ্যপূর্ণ দলিল দস্তাবেজের অবিকল প্রতিরূপ তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া। ইংরাজীতে একে আমরা বলতে পারি, 'মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন অব রিডিং মেটেরিয়ালস টু ইউজারস'।

এটা উপলব্ধি করতে পারি, তথ্যসমাযোজনে গতি আনয়নে এই ডকুমেণ্টেশন প্রক্রিয়া যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে, বর্তমান যুগে তা সত্যই বিস্ময়কর।

ডকুমেণ্টেশনের কাজ :

(১) ডকুমেণ্টের অবস্থান নির্ণয় ও তথ্যসমূহকে বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সূত্র থেকে খুঁজে বার করাই প্রধানতঃ ডকুমেণ্টশনের কাজ।

(২) ডকুমেণ্টগুলোর সারকরণ—বিশেষতঃ অত্যাধিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলোর সারকরণ একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকার সমগ্র বিষয়ের সারকরণ হতে পারে, আবার বিশেষ কতকগুলো টপিক বেছে নিয়েও সারকরণ হতে পারে।

(৩) **বর্গীকরণ**—বর্গীকরণের মাধ্যমে সমস্ত তথ্যমূলক ডকুমেণ্টগুলোকে সাজিয়ে রাখতে হয়। বিশেষ বিষয়কে সঠিকভাবে সারকরণ করবার পর যদি তাকে বর্গীকরণ না করা হয়, তবে সারকরণের সুফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে যদি ফেসেটেড স্কিম বা প্রকল্প অনুযায়ী বর্গীকরণ করা হয়, তবে ডকুমেণ্টেশন সঠিকভাবে করা সম্ভব। বর্গীকরণের প্রস্তুতকরণের মুখ্য কাজ হচ্ছে, স্কীম অনুযায়ী বর্গীকরণ করার পর বিষয়ীভূত ডকুমেণ্টগুলোকে সাজিয়ে নেওয়া এবং প্রত্যেকটি সারযুক্ত ডকুমেণ্টের উপর একটি ক্রমিক নম্বর দিয়ে দেওয়া। যখনই ব্যবহারকারীর প্রয়োজন হবে, তখনই যাতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ডকুমেণ্টগুলোকে একসাথে ব্যবহার করবার সুযোগ থাকে।

(৪) **ডকুমেন্টের নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণ**—একথা আমাদের বোঝা দরকার যে বই ক্যাটালগ করার চেয়ে ডকুমেন্টের নির্দ্দেশক প্রস্তুতকরণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিষয় অনুযায়ী নির্দ্দেশক কার্ডগুলো প্রস্তুত করে সারকরণ অনুযায়ী বর্গীকরণের নম্বর বসাতে হয়, এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় লেখকের নাম, (Citation) ডকুমেন্টের শিরোনাম (Title), সাময়িক পত্রের নাম, (Journal), ভলিউম নম্বর, অংশ (Part), পৃষ্ঠা, এবং সারের ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি। যদি বর্গীকৃতভাবে ডকুমেন্টগুলোকে সাজাতে হয়, তবে শৃঙ্খল নির্দ্দেশকের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

(৫) সর্বশেষে, সমস্ত কাজের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পাবো **একটি পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টেশন লিষ্ট**। এটা অভিধানিক আকৃতিতেও পেতে পারি বা বর্গীকৃত আকৃতিতেও পেতে পারি, যার সঙ্গে থাকবে বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক নির্দ্দেশক অথবা বর্গীকৃত শিরোনাম নির্দ্দেশক। শেষোক্ত আকৃতিটি অধিক বাঞ্ছনীয়।

ডকুমেন্টেশন সেবা ঃ

(১) তথ্য ব্যবহারকারীকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবার নিমিত্ত নির্দ্দেশক মারফৎ ডকুমেন্টের হদিশ করতে হয়, এবং এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়ার ভেতরেই ডকুমেন্টশন সেবার মূল চাবিকাঠি রয়েছে।

(২) তথ্যকেন্দ্রে যে সমস্ত ডকুমেন্ট রয়েছে তা সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের হাতে তুলে দিতে হবে।

(৩) আন্তর্তথ্যকেন্দ্রিক ডকুমেন্ট লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য ব্যবহারকারীকে সহযোগীতা করতে হবে।

(৪) ফটোস্টাট, ফটোকপি, মাইক্রোফিলম, মাইক্রোফিস প্রভৃতি প্রতিরূপের মাধ্যমে তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদার মধ্যে ডকুমেন্টেশনের সেবা দেওয়া যায়।

(৫) একথা মনে রাখতে হবে, কারিগরী বিষয়ের অনুবাদ সেবা, ডকুমেন্টেশন সেবার একটি প্রধান কাজ। বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত তথ্যমূলক ডকুমেন্ট তথ্যকেন্দ্রে আসে। অনেক সময় তথ্য ব্যবহারকারীর পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সেটা ভাষাগত কারণেই হয়ে থাকে, তাই

যদি এই সমস্ত ডকুমেন্টগুলোকে অনুবাদ করা যায়, তবেই তথ্যব্যবহারকারীকে আমরা সেবা করতে পারব।

সর্বশেষে বিশ্বের কয়েকটি তথ্যকেন্দ্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

(১) ভারত—ইনসডক (**Insdoc, New Delhi**) নিউ দিল্লী।

(২) গ্রেটবৃটেন (**Great Britain**)—এ্যাসলিব (**Aslib, London**) লণ্ডন।

(৩) ইউ. এস এ (**USA**)—আমেরিকান ডকুমেণ্টশন ইনস্‌টিটিউট, ওয়াশিংটন, (**American Documentation Institute, Washington, D.C.**)

—লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটন (**Library of Congress, Washington**)।

—কাউনসিল অব ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ, স্কুল অব লাইব্রেরী সাইন্স, ওয়েষ্টারন্‌ রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি, ক্লিভল্যাণ্ড (**Council of Documentation Research, School of Library Science, Western, Reserve University,** (**Cleveland**)।

(৪) ইউ. এস. এস. আর (**USSR**)—ভিনিটি (**VINITI—Union Institute for Scientific and Technical Information**) in মস্কো (**Moscow**)।

(৫) নেদারল্যাণ্ড (**Netherlands**)—নেদারল্যাণ্ডস্‌ ন্যাশানাল ডকুমেণ্টশন সেণ্টার, নিদার (**Netherlands National Documentation Centre**)।

(৬) ফ্রান্স (**France**)—সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ডি লিজ রিসার্চই সাইন্টিফিক্‌ পেরিস্‌, (**Central Nastional de les Researche Scientific, Paris**)।

(৭) জাপান (**Japan**)—ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরী, টোকিও (**National Diet Library, Tokyo**) টোকিও ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজি (**Tokyo Institute of Technology**), জাপান ইনফরমেশন সেণ্টার অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, টোকিও (**Japan Information Centre of Science & Technology, Tokyo**)।

(৮) ইজিপ্ট (**Egypt**)—এডুকেশনাল ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার, কায়রো (**Educational Documentation Centre, Cairo**)।

পরিশিষ্ট (খ)

ইন্‌সডক (Insdoc)

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তখন থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পরাধীন থাকা কালীন বৃটিশ সরকার বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আগ্রহ দেখায়নি। বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় ১৯৪৭ সালে, যখন ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মানব সংস্থা এবং ভারতীয় মানব সংস্থাকে একটি উন্নত তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা বিষয়ে খতিয়ে দেখতে বলে। তাতে বিশেষ কোন কাজ না হওয়ায় আমরা দেখলাম দ্বিতীয় প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। তদানীন্তন ভারত সরকারেয় সেক্রেটারী শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মরিস গাওয়ার এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। এদের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ডঃ রঙ্গনাথন একটি জাতীয় তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেন এবং এর ফলশ্রুতি হিসবে ১৯৫২ সালে ইন্‌স্‌ডকের প্রতিষ্ঠা হল। ইন্‌স্‌ডকের পুরোনাম ইনডিয়ান সাইনটিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার। প্রশাসনগতভাবে এটি সি. এস. আই. আর এর অধীন। কিন্তু ইন্‌স্‌ডকের তথ্য সেবা শুধু সি. এস. আই. আরের মধ্যে নয়। এর তথ্য পরিসেবা বিশ্ববিদালয় ও শিল্পদ্যোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত।

ইন্‌স্‌ডকের কার্যসূচীতে প্রথমদিকে যা ঘোষিত হয়েছিল, পরের দিকে তা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সেই সমস্ত প্রাথমিক কর্মসূচীর সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। যেমন—(১) বিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা, (২) সঠিক বুলেটিনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের তথ্য দিয়ে নবলব্ধ জ্ঞানের আলো পেঁছে দেওয়া, (৩) লব্ধ সংগ্রহকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর দান করা, (৪) গবেষকদের প্রয়োজনে ফটোকপি ও অনুবাদ প্রস্তুত করা। (৫) এদেশে প্রকাশিত সকল প্রকার বিজ্ঞান সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করা। (৬) ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে সারা বিশ্বকে অবহিত করার কাজ ইন্‌সডককে হাতে নেওয়ার দায়ীত্ব দেওয়া হয়।

বর্তমানে ইনস্ডকের কার্য্যাবলীর প্রসঙ্গে বলতে গেলে একথা বলে রাখা ভালো যে, ১৯৫৪ সাল থেকে প্রকাশিত ইন্স্ডক লিষ্ট ১৯৬৫র পর আর প্রকাশিত হয়নি। তবে পরিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করলে নেহাত কম হবে না। যেমন, রুশ বিজ্ঞান তথ্যকেন্দ্র, জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রকল্প। যাই হোক, বর্তমানে ইন্স্ডক নিম্নলিখিত কাজগুলো করে চলেছে।

(ক) ডকুমেণ্ট সরবরাহ সার্ভিস।

(খ) গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতিকরণ ও সেবা।

(গ) অনুবাহ সার্ভিস।

(ঘ) রুশবিজ্ঞান তথ্য কেন্দ্র মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্দের রাশিয়ায় প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়।

(ঙ) মুদ্রণ ও রেপ্রগ্রাফী সেবা।

(চ) জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার লক্ষাধিক সংগ্রহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্দের সাহায্যের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

(ছ) ইউনিয়ন ক্যাটালগ তথ্যসেবার সহযোগীতার কাজে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। জাতীয় স্তরে ইউনিয়ন ক্যাটালগের কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৮৫ সালে কাজ শেষে হবার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সতেরো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে ইউনিয়ন লিষ্ট অব কারেণ্ট সাইণ্টিফিক সিরিয়ালস্ ইন ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেছে।

(জ) কম্পিউটারের প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে।

(ঝ) প্রকাশনার ব্যবস্থা রয়েছে।

(ঞ) অ্যানালস্ অব লাইব্রেরী সায়েন্স এণ্ড ডকুমেণ্টেশন উল্লেখযোগ্য প্রকাশন, যা আধুনিক খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে।

(ট) ইন্স্ডকের নিয়মিত প্রকাশনের মধ্যে রয়েছে। (১) ন্যাশনাল ইনডেক্স অব ট্রানশ্লেসন (২) ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী অব সাইণ্টিফিক রিসার্চ ইন্স্টিটিউসন ইন ইন্ডিয়া। (৩) ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী অব ইণ্ডিয়ান সাইণ্টিফিক পিরিয়ডিকালস। (৪) ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছে ডাইরেক্টরী অব কারেণ্ট রিসার্চ প্রজেক্ট ইন সি. এস. আই. আর লেবরেটরিজ (৫) ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে রোষ্টার অব ইনডিয়ান সাইণ্টিফিক টেকনিকাল ট্রানস্লেটরস্ ইত্যাদি।

(ঠ) দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সংস্থা ছাড়াও অনেকগুলো রিজিওনাল সেণ্টার স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো কলকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোরে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

(ড) ইন্‌স্‌ডকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

(ঢ) আন্তর্জাতিক সহযোগীতার কথা বলতে গেলে তথ্যবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ইন্‌স্‌ডক আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে এফ. আই. ডি. এবং ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। ইউনেস্কোর ইউনিসিস্ট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইন্‌স্‌ডক পূর্ণ সহযোগীতা করছে।

ডি. আর. টি. সি. (ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার): এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পেছনে ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা দরকার। তিনি যখন ইনডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ণধার তখন তাঁর আগ্রহে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে ডি. আর. টি. সি. বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়। এটি ইনডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একটি শাখা।

ডি. আর টি. সি.-র কার্য্যাবলী: (১) ডকুমেণ্টেশনের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা, (২) এ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, (৩) তথ্যকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের গুণগত মান বর্দ্ধনে সেমিনার, রিফ্রেশার্সকোর্স চালু করা, (৪) সকল বিষয়ের সুক্ষ্মসূচী প্রস্তুতিকরণ (**Depth Schedule**) এবং কোলন বর্গীকরণের সফল প্রয়োগ করে চলেছে, (৫) তথ্য পরিবেশনে কমপিউটার প্রয়োগে এই সংস্থা সফল হয়েছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ডি. আর. টি. সি তথ্যবিজ্ঞান পাঠক্রম সর্বজন বিদিত। দেশে বিদেশে এদের পাঠক্রমের মান প্রশংসা লাভ করেছে। ১৯৬২ সালে যে পাঠক্রম শুরু হয়েছিল, তা আজকে যে পর্য্যায়ে এসে পেঁছেছে, তাতে সন্দেহ নেই, আগামী দিনে এই পাঠক্রম একটি আদর্শ স্থানীয় পাঠক্রমে রূপান্তরিত হবে। পাঠক্রমের শেষে শিক্ষার্থীদের 'এ্যাসোসিয়েটশিপ ইন ডকুমেণ্টেশন এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সায়েন্স' উপাধি দেওয়া হয়। এদের সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্য নিয়ে যে খণ্ড প্রতিবছর প্রকাশিত হয় তা, ডি. আর. টি. সির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। সম্প্রতি এদের সিলভার জুবিলি সেমিনার হয়ে গেল ১৯৮৮ সালে। এতে ইনফরমেশন সায়েন্স ও ইনফরমেশন সোসাইটীর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কোলন ক্লাসিফিকেশনের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

তথ্যপঞ্জী

অনূপূরক পাঠ্য তালিকা

অর. আর. এইচ—

ডেভেলপমেণ্ট অফ মেথডলজিক টুলস্ ফর প্ল্যানিং এ্যান্ড ম্যানেজিং লাইব্রেরী সার্ভিসেস (বুলেটিন অফ দ্য মেডিকেল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন ৫৬, ১৯৬৮ জুলাই ২৪১—৬৭)।

অষ্টিন, ডি—

প্রেসিজ লাইব্রেরী সায়েন্স, ১৯৭৫, ১২ (৪)।

উইনফিল্ড, বি—

ডকুমেণ্ট ট্রান্সফার বাই স্যাটেলাইট (ইন এ্যাসলিব প্রসিডিংস, ৬·৩৬ ন. ৪, ১৯৮৪)।

উইলিয়ামস, এ. সি. এ্যান্ড ভান্দিওয়াদ, এ—

এ জেনারেটিং ফ্যাংশন এ্যাপ্রোচ টু কিউইং নেটওয়ার্ক এ্যানালিসিস অফ মাল্টি প্রোগ্রামড কম্পিউটারস নেটওয়ার্ক ৬, ১—২২।

উড, ডি. এন—

ইউজ স্টাডিজ : এ রিভিউ টু লিটারেচার ফ্রম ১৯৬৬ টু ১৯৭০, অ্যাসলিব প্রসিডিংস ১৯৭১ (২৩) (১) পৃঃ ১১—২৩।

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লাইব্রেরী এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, এড. বাই. এ. কেণ্ট এ্যান্ড আদাস, ৫২।

ওলে, জে. জি.—

এ গাইড টু সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন লাইব্রেরীজ ১৯৮৪।

ওয়েইটম্যান, সি—

ডিস্ট্রিবিউটেড মাইক্রো-মিনি কম্পিউটার সিস্টেমস্ ১৯৮০, ইঙ্গেলউড ক্লিফ। এন. জে. প্রেণ্টিস-হল, ১৯৮০।

কুমার, কৃষাণ—

থিয়োরী অফ ক্লাসিফিকেশন, নিউ এড, ১৯৮৮

কোবায়াসি, এইচ—

এ্যাপ্লিকেশনস্ অফ দ্য ডিফ্যুশন এ্যাপ্রোক্সিমেশন টু কিউইং নেটওয়ার্কস্ (টু পার্টস), জে এ সি এম, ভল ২১।

ক্লনিন, বি—

দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ইন এ্যাসলিব প্রসিডিংস, ৫.৩৮ নং ৪)।

ক্লিনরক, এল—

কিউইং সিস্টেমস, ভল ১—থিয়োরী, জন উইলি এ্যান্ড সন্স, নিউইয়র্ক।

খান্না, কে. কে—

লাইব্রেরী অ্যান্ড সোসাইটি, ১৯৮৭।

গারফিল্ড, ই—

সাইটেশন ইনডেক্সিং, ১৯৭৯।

গুহ, বি—

ডকুমেন্টেশন, ই ১২, ১৯৮৩।

গুহ, বি—

ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড ইনফরমেশন ; ২য় সং, ১৯৮৩।

গুহ, বি—

ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস : টেকনিকস এ্যান্ড সিস্টেম, ১৮৮৩।

গ্রোগান, ডি—

সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি : এ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য লিটারেচার, সেকেন্ড এড, ১৯৭৭।

চক্রবর্ত্তী, এ. আর—

তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা, ১৯৮৬।

চক্রবর্ত্তী, এ. আর এ্যান্ড চক্রবর্ত্তী, বি—

ইন্ডেক্সিং, ১৯৮৪।

ডমবক্সা, মানা—

ডকুমেন্টেশন, [এন. ডি]।

তানবি, এম—

নোটস অন দ্য ইউজ অফ রোলস এ্যান্ড লিংকস ইন কো অর্ডিনেটিং ইন্ডেক্স। আমেরিকান ডকুমেন্টস ১৯৬১,১২, ৯৮-১০০।

ত্রিবেদী, কে. এস.—

প্রবাবিলিটি এ্যান্ড স্টাটিসটিকস উইথ রিলায়বিলিটি, কিউইং এ্যান্ড কমপিউটার সায়েন্স এ্যাপ্লিকেশন, ১৯৮৮ (পি পি ৪১১—৪৬৭)।

থিয়াগরাজন, আর—

সিস্টেমস্ এ্যানালিসিস্ ইন দ্য লাইব্রেরী ১৯৮২ (ইন ওয়ার্কশপ অফ কম্পিউটার টেকনিকস্ ইন ইনফরমেশন প্রসেসিং মার্চ ৩—৮, ১৯৮০, ডিপ অফ লিব. সা. দিল্লী ইউনিভ)।

পার্কার সি. সি. এন্ড ষ্টালি, আর, ডি—

ইনফরমেশন সোর্সে'স ইন সায়েন্সেস।

এ্যান্ড টেকনোলজি, ১৯৭৫।

প্রাইস, ডেরেক ডে সোলা—

সায়েন্স সিন্স ব্যাবিলন, ১৯৬১।

ফস্কেট, এ. সি.—

দ্য সাবজেক্ট এ্যাপ্রোচ টু ইনফরমেশন, ফোর্থ এড, ১৯৮২।

ফস্কেট, ডি. জে. এড—

লাইব্রেরী সিস্টেম এ্যান্ড ইনফরমেশন ঃ প্রসিডিংস টু দ্য সেকেন্ড এ্যাংলো চেক কনফারেন্স অফ ইনফরমেশন স্পেশালিষ্ট, ১৯৭০।

বার্ক, পি. জে—

আউটপুট অফ এ কিউইং সিস্টেম, অপারেশনস্ রিসার্চ,

ভল ৪, পিপি ৬৯৯—৭০৪।

ব্যানার্জী, পি. সি.—

ক্লাসিফিকেশন, ১৯৮৪।

ভট, এম, জে—

সায়েন্টিষ্টস্ এ্যাপ্রোচেস টু ইন্‌ফর্‌মেশন্, ১৯৬১।

ভট্টাচারিয়া, জি—

পপ্‌সি লাইব্রেরী সায়েন্স ডকুমেন্টেশন, ১৯৭৯, প্যাপ এ।

ভান্দিওয়াদ, আর এ্যান্ড উইলিয়ামস্, এ. সি.—

"কিউইং নেটওয়ার্ক মডেলস, অফ কম্পিউটার সিস্টেমস" থার্ড টেক্সাস কনফারেন্স অন কম্পিউটিং সিস্টেমস, নভেম্বর ১৯৭৪।

মহাপাত্র, পি—

দ্য কম্পিউটার ইন লাইব্রেরী সার্ভিসেস, ১৯৮৫।

মার্ক, পি—

দ্য ইনফরমেশন ইকনমি ঃ ডেফিনিশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ১৯৭৭।

মিডো, চার্লস, টি—

দ্য এ্যানালিসিস অফ ইনফরমেশন সিস্টেমস, ১৯৭৩।

মদুর, জেড—

সিস্টেম এ্যানালাইসিস : এ্যান ওভারভিউ (স্পে. লিব, ৫৮, ফেব্রু. ১৯৬৭)।

যোগী, এম. জি. এ্যাণ্ড নারায়ণ জি, জে—

কারেণ্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিসেস—হোয়াট ইট ইজ ?

রঙ্গনাথন, এস. আর—

চেইন প্রসিডিওর এ্যাণ্ড ডিক্সনারী ক্যাটালগ এ্যানালিসিস, অফ লাইব্রেরী সায়েন্স, ১৯৫৪।

রঙ্গনাথন, এস. আর—

ডকুমেণ্টেশন এ্যাণ্ড ইটস্ ফ্যাসেটস্, ১৯৬৩।

রঙ্গনাথম, এস. আর—

প্রলেগমেনা টু লাইব্রেরী ক্লাসিফিকেশন, ১৯৬৭।

রাজন, টি. এল, এ্যাণ্ড রামস্বামী, কে—

ইনটারন্যাশনাল ষ্টান্ডার্ডস বুক নাম্বার।

রাজেন, জে. পি—

"এ কিউইং নেটওয়ার্ক মডেল অফ এম ভি এস", এ. সি. এম কমপিউটিং সার্ভেস, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

রাজেশ্বরী, এ. আর—

কিউইং মডেল (পেপার সাবমিটেড ইন দ্য ওয়ার্কশপ অন "কমপিউটার টেকনিকস্ ইন ইনফরমেশন প্রসেসিং" মার্চ ৩—৮, ১৯৮০ এ্যাট দ্য ডিপার্টমেণ্ট অফ লাইব্রেরী সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লী)।

রায়, ডি. কে—

ইমারজিং ইনফরমেশন সোসাইটি এ্যাণ্ড ইটস্ ইমপ্যাক্ট অন ইনফরমেশন পারসোনেল ডেভেলপমেণ্ট।

রায়, ডি. কে—

সিস্টেমস্ এ্যানালিসিস্ ইন ইনফরমেশন সেণ্টার (ইন গ্রন্থাগার, ৬, ৩৬, নং ৯—১০, ১৯৮৭)।

রেসার, এম এ্যান্ড সয়ার, সি. এইচ—

কিউইং নেটওয়ার্কস উইথ মাল্টিপ্‌ল্‌ ক্লোজড চেইনস ঃ থিয়োরী এ্যান্ড কমপিউটেশনাল এ্যালগোরিদম্‌স্‌, আই. বি. এম জার্নাল অফ রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ১৯৭৫।

ল্যাম, এস—

কিউইং নেটওয়ার্কস উইথ পপুলেশন সাইজ কনষ্ট্রানস্‌, আই. বি. এম জার্নাল অফ রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ১৯৭৭।

সালমন, এস.আর, এড—

লাইব্রেরী অটোমেশন ঃ এ ষ্টেট অফ দ্য আর্ট রিভিউ, ১৯৬৭।

সেনগুপ্ত, আই. এন—

বিবলিওমেট্রিক্স ঃ এ বার্ডস আই ভিউ (ইন ইয়াসলিক বুলেটিন ৩০ (৪) ১৯৮৫, ১৬৭—১৭৪)।

সেনগুপ্ত, বি. এ্যান্ড চ্যাটার্জী, এম. ইন এ্যাসোসিয়েশন উইথ চ্যাটার্জী, এস।

ডকুমেণ্টেশন এ্যান্ড ইনফরমেশন রিট্রিভাল, ১৯৭৭।

হ্যানসন, সি. ডবলু—

ইনট্রোডাকশন টু সায়েন্স ইনফরমেশন ওয়ার্ক, ১৯৭১।

সাধারণ নির্ঘণ্ট

অ

অটোমেশন ১৬
অডিও ৪৩
অডিও ভিস্যুয়াল ৪২
অর্থনীতিবিদ্যা ৫১
অনলাইন ইলেকট্রনিক্স ৮
অনলাইন ডাটাবেস ৮
অনলাইন সার্ভিস ৮, ১৩, ২১, ১১৯
অনলাইন সিস্টেমের এজেন্সীগুলোর কয়েকটি নাম ১৩৪
অনলাইন সিস্টেমের নাম ১৩৩
অনলাইন সিস্টেমের মূলনীতি ১৩৪
অনুনথি ৪২, ৪৩
অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ১৩৪
অনুসন্ধানের পদ্ধতি ৬৭
অন্তর্বিষয় ১৯
অটোমেটিক সায়েন্স সাইটেশন ১৩৬
অদৃশ্য কলেজ ১৩৯
অপেক্ষমান সারির প্রতিরূপ ১২৪, ১২৫
অপ্রচলিত নথি ৪২
অপ্রচলিত নির্দেশক ৫৮
অসংগঠিত ধারণা ৩১
অস্টিন ৫৫

আ

আই আই ডি ২৬
আই আই বি ২৬
আই এস আই ৯
আই এস ডি এস ১৩৬
আই ও সকেট ১২০
আই বি এস ১৪
আইসোলেট ৩১, ৩৩
আউটপুট ১১৬
আকরগ্রন্থ ২০, ৪৪
আধুনিক চাহিদা ১৯, ২১
আধুনিক তথ্যসমাজ ৬
আনবিগ যুগ ১১
আনবিক শক্তি ৩৭
আনসট লিংক ৫১
আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক গ্রাম ১৪
আমেরিকা ১৮
অ্যাসলিব ২৬, ২৮

ই

ই এ এস ২১
ইউ এস ব্যুরো অফ লেবার ২
ইউ ডি সি ৩০, ১০৭
ইউজিন গারফিল্ড ৯, ৬৯
ইউনিডো ১৩৭
ইউনেসকো ২৬, ১৪২
ইউরোনেট ২১, ৪০
ইকনমেট্রিকস ৭৫
ইকস্থু ৪০
ইনটার সাবজেক্ট ফেজরিলেশন ৩১
ইনট্রা এ্যারে ফ্যাসেট ৩২
ইনট্রা সিডিউলড্ ফেজরিলেশন ৩২
ইনডেক্স মেডিকাস ৪০
ইনপ্যুট ১১৬
ইনফরমেটিকস ২৯, ১৪০
ইনফরমেট্রিক্স ৭৫
ইনকোলাইন ৪০
ইনষ্টিটিউট ফর সায়েণ্টিফিক ইনফরমেশন ৯, ৬৯
ইনস্ডক ২৬, ৪০, ১৪৩
ইনস্পেক ৪০, ১৩৭
ইনিস ৪০
ইরানডক ২৬
ইলেকট্রন ৫
ইলেকট্রনিক ডাটাবেস ১৩
ইলেকট্রনিক বিদ্যা ১৪
ইলেকট্রনিকস ১৪, ১৫
ইয়াসলিক ২৮

উ

উষ্ণমানের তালিকার ব্যবহার ৭০
উষ্ণমানের সাময়িক পত্রপত্রিকার তালিকা প্রস্তুত করণ ৭০
উচ্চস্তর ৪৯
উল্লেখস্বরূপ নির্দ্দেশক ৮১

এ

এ এ সি আর ১৪০
এ এ সি আর এর গঠনমূলক বৈশিষ্ঠ্য ১৪০
এ কে আর্লেণ্ড ১২৩
এ ডি আই ২৮
এইড্স ১৩৬
একক পদ্ধতি ৫৯
একাধিক গবেষক ২১
একীকরণ ৩৩
এগ্রিস ৪০
এফ আই ডি ২৬, ৭৫, ১৪২, ১৪৩
এরিয়া ষ্টাডি ৩৪
এস আর সি ১৩৭
এস এস ডি সি ৪০

এস ডি আই ২৮, ৪৭, ৮২
এস ডি আই সার্ভিস ১১৮
এস ডি সি ৪০
এস সি ব্রাডফোর্ড ২৬
এ্যাডাম স্মিথ ৭১
এ্যানালগ কর্মপিউটার ১৩৫
এ্যানাল্‌স্‌ অফ লাইব্রেরী সায়েন্স ২৬
এ্যারাইভাল টাইম ১২৫
এ্যারোস্পেস রিসার্চ ৮

ও

ও কোনার ৭৪
ওলি জে সি ৪১
ও সি এল সি ৪০
ওয়াডেক্স ৬৩

ক

কনফারেন্স বার্ত্তা ২১
কর্মপিউটার ৪, ৬, ৮, ১০, ১৩, ১৬, ২১, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৫
কর্মপিউটার বিজ্ঞান ১১
কর্মপিউটার বিপ্লব ১০
কর্মপিউটারের ভাষা ১৩৫
কর্মপিউটারের সুবিধা ১৩৩
কমার্শিয়ালাইজেশন ১৬
কলাকৌশল ১৩
কলাকৌশলগত পরিবর্ত্তন ৬৫
কলাবিদ্যা ২৪
কারেন্ট এ্যাওয়ারনেস সার্ভিস ২০
কিউয়িং টেকনিক ১২৫
কিউয়িং পদ্ধতি ১২২
কিউয়িং মডেল ১২৩
কিটার্ম নির্দ্দেশক ৬৩
কোডাটা সেণ্টার ১৩৯
কোম্‌পার ১৩৯
কেন্দ্রিয়সূচী ২৮
কেলভিন মুর ২৮
কোলন বর্গীকরণ ৩০, ৫১
ক্যাটালগ ৪৯, ৬৬
ক্যাড ৮০
ক্যাসেট ৪২
কৃষিবিজ্ঞান ৫১
ক্রম অনুযায়ী ২১
ক্রমিক বৃদ্ধি ১৮
ক্লিক সূচী ৬২

গ

গণেশ ভট্টাচার্য ৫০
গবেষক ৭, ১৯, ৪০, ৪১
গবেষণা ৩, ৭, ২৪, ৪৪
গারফিল্ড ৭৫
গারফিল্ডের কেন্দ্রীভূতকরণ নীতি ৮০

গুণবাচক ক্রিয়া ৫১
গৌরচন্দ্রিকা ৪২
গ্রন্থপঞ্জী ৪৪
গ্রন্থপঞ্জীকরণ ২৭
গ্রন্থপঞ্জীসংযুক্তিকরণ ৭২
গ্রন্থাগার ৯, ৩৬, ৩৭
গ্রন্থাগার পরিচালনা ২৪
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ২৪, ৩৭
গ্রন্থাগারিক ৩৭
গ্রন্থাগারিকতা ২৪, ২৮
গ্রিফিৎস ৮০
গ্রোগান ডি ৪৩
গ্লস ৭৪

চ

চলমান গবেষণার তালিকা ৪৪
চাহিদার মূল্যায়ণ ২২
চিহ্ন ম্যানিপুলেটর ২
চেন নির্দ্দেশক ৪৯
চেন পদ্ধতি ৫১
চেনি ২৯

জ

জাতীয় গ্রন্থাগার ৪১
জিপফ ৭৪, ৮১
জিপফের অনুশাসন ৭৭
জীববিদ্যা ৩৮
জেনাস ৫৫
জেরক্স ১৩৯
জ্ঞান বিস্ফোরণ ১০, ৩৭
জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ৪
জ্ঞানের পরিশ্রাবণ ৭

ট

টারসিয়ারী সোর্স ৪৪
টিম রিসার্চ ৯
টুল্‌স্‌ ৩২
টেকনোসেন ১৬
টেপ্‌স্‌ ৪২
টেবল্‌স্‌ ৩৯
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ২১
টোকার ২, ৩, ৪
ট্রিটিজ ৪৪

ড

ডঃ আই এন সেনগুপ্তজ ১৩৮
ডঃ সেনগুপ্তের তথ্যপঞ্জী পরিমাপক নীতি ৮০
ডকুমেন্টেশন, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯
ডকুমেন্টেশনের কাজ ১৪৪
ডকুমেন্টেশনের সেবা ১৪৪

ডাটা ১৪, ২১, ৬৬
ডাটা ইভ্যালুয়েশন সেন্টার ১৩৯
ডাটা ডিসিমিনেশন সেন্টার ১৩৯
ডাটাবেস ৮, ৯, ১২০, ১৩৫
ডাটাবেস গঠনের উপাদান ১৩৩
ডাটা ব্যাঙক ৮, ১৩৫
ডাটা রেফারেন্স পদ্ধতি ১৩৯
ডাটাসিস্টেম ১৩৬
ডায়ালগ ২১
ডায়লগ সার্ভিসের সেবা ১৩৩
ডি আর টি সি ১৪৩
ডি সি ৩০
ডিজিটাল কমপিউটার ১৩৫
ডিস্ক ৪২
ডেসিডক ৪০
ডোভারুভ ৭৫

ত

তত্ত্ব ৩
তথ্য ৪৩
তথ্য উদ্ধার ১৬
তথ্য উদ্ধার পদ্ধতি ৬৬
তথ্য উদ্ধারের দিক ৬৪
তথ্য উৎপাদন ১৬
তথ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ১৮
তথ্য কর্মী ২, ১৭
তথ্য কেন্দ্র ২০, ২২, ৩০, ৮৬
তথ্যকেন্দ্রীক ১৫
তথ্যজগত ২
তথ্যপঞ্জী পরিমাপক ৭৪, ৮১, ৮২
তথ্যপঞ্জী পরিমাপক অনুশাসন ৭৯
তথ্যপঞ্জী পরিমাপকের সংজ্ঞা ৭৬
তথ্য পরিবেশন ৩৬, ৪১, ৪৫
তথ্য পরিসেবা ৭, ১৪, ২৪
তথ্য প্রবাহ ৩৭
তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যা ১৩, ১৮
তথ্য প্রেরণ ব্যবস্থা ৬৫
তথ্যবাজার ৮
তথ্যবাজেট ১৬
তথ্যবাস্তুকার ২
তথ্যবিকেন্দ্রীকরণ ১৫
তথ্যবিজ্ঞান ২, ৬, ৭, ১০, ১৭, ২৪
২৫, ২৮, ২৯, ৪২, ৭৪
তথ্যবিজ্ঞানী ১, ২, ৫, ১৩, ১৭, ১৯,
২০, ২১, ২২, ৩৯, ৪০, ৬৮
তথ্যবিদ্যা ১৩
তথ্যবিপ্লব ২, ৪
তথ্যবিশ্লেষক ২৭
তথ্য বিস্ফোরণ ৫, ১৫
তথ্যব্যবহারকারী ১৯, ২০
তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদা ২২
তথ্যব্যবস্থা ১৫
তথ্যব্যুরো ১৫
তথ্যভিত্তিক সমাজ ১, ২, ৪, ৫, ১৩,
১৫, ১৭, ২৯, ৬৭, ৬৮
তথ্যমূলক চেন ১৩৭

তথ্যম্যানেজমেণ্ট ৭
তথ্যযুগ ৪
তথ্য লেনদেন ব্যবস্থা ৬
তথ্যসংগ্রহের মান ২০
তথ্যসংগ্রহের মানকে উন্নত করার চাহিদা ১৯
তথ্যসমাজ ১৭
তথ্যসমাযোজন ৮২
তথ্যসমাযোজন প্রক্রিয়া ৭৭
তথ্যসম্প্রসারণের গতি ১৩
তথ্য-সমৃদ্ধ নথির প্রস্তুতিকরণ ৬৬
তথ্যসরবরাহ ৭
তথ্যের আকার ২৯
তথ্যের ইনপুট ৬৭
তথ্যের বাহ্যিকরূপ ৪২
তথ্যের সংগ্রহণের সমস্যা ৯

থ

থিসিস ৩৯

দ

দূরদর্শন ৩৭
দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত জ্ঞানরাজ্য ৬৯

ধ

ধারণা ৩২
ধ্রুবক ৭৮, ১২৫

ন

নথি উদ্ধারের স্বরূপ ৬৭
নথিপত্র ১০, ১২, ৪৪
নথি সংগ্রহ ২৪
নবপ্রচলিত নথি ৪২
নিউট্রন ৫
নির্দেশক ২২, ২৪, ২৭, ৪৯
নির্দেশক প্রস্তুতিকরণ ২৫
নির্দেশক যন্ত্র ৩, ৯, ১৮
নির্মোচন ৩৩
নিসাত ৪০, ১৩৭
নিয়ন্ত্রণ ৭
নীলমেঘন ৫০
নেটওয়ার্ক ১৩, ১৬
নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ৮২

প

পটারের সংজ্ঞা ৭৭
পথনির্দেশ ২১
পদার্থবিজ্ঞান ও সুপার কণ্ডাক্টিভিটি ১৩৬
পরিচালনা ক্ষেত্র ১৪
পরিসেবা ২০
পল অটলেট ২৬

পদার্থবিজ্ঞানভিত্তিক যুগ ৫
পদার্থবিদ্যা ২৫, ৩৮
পদ্ধতি বিশ্লেষণ ১০, ১৯, ২৯
পপুসি ৫১
পপুসির ব্যাকরণগতদিক ৫২
পপুসির মূলনীতি ৫১
পরিচালন ১৮
পাঞ্চকার্ড ২৮
পাঠক প্রোফাইল ৪৭
পাঠ্যবই ৪৪
পাতন প্রক্রিয়া ৩৪
পাসকেল ১৩৬
পিতামাতা ১
পিণ্ডীভবণ ৩৪
পুস্তক লেনদেন প্রক্রিয়া ১১৯
পেটেণ্ট ৪৩
প্যাকেট সুইচ্ড্ নেটওয়ার্ক ১৪
প্যানডক ২৬
প্যাপিরাস ৩৬
প্রয়োগবিজ্ঞান ১৯
প্রাইস ৫, ৬, ৬৯, ৭৪
প্রাইসের বর্গমূল অনুশাসন ৭৯
প্রাত্যহিক চাহিদা ২১
প্রান্তিক উৎস ৪৪
প্রিচার্ড ৭৫
প্রেসিজ ৫১, ৫৫
প্রোটন ৫
প্রকর্মীসমাজ ৪
প্রকরণ গ্রন্থি ৯
প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি ৪৭
প্রচলিত নথি ৪২
প্রতিদিনকার চাহিদা ২০
প্রতিদিনের চাহিদা ১৯, ২০
প্রতিযোগীতামূলক বাজার ১৪
প্রবন্ধ ৯
প্রযুক্তিবিদ্যা ৪, ৭, ১০, ১৫, ১৬
২৪, ৩৬
প্রশ্নের কাঠামো ৫১
প্রয়োগ কৌশল ৭, ২০

ফ

ফিল্ম ৪২
ফিশন ৩৩
ফুটনোট ৬৯
ফেদারণ ৭৫
ফেনোমেনা ষ্টাডি ৩৪
ফ্যাক্ট সার্ভিস ২১
ফ্যাসেট ৩০

ব

বই নির্বাচন ২৪
বক্ররেখা ১৮
বর্গীকরণ ২৪, ২৭, ৩০, ৪০,
৫০, ৬৬

বর্গীকৃত নির্দেশক ৪৯
বর্গীকৃত পদ্ধতি ৪৭
বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশক ৪৯
বার্ক ১৪৩
বাণিজ্যিক ডাটাবেস ৮
বায়োটেক্নোলজি ১৩৫
বিগ সায়েন্স ৬, ৭
বিচ্ছুরণ সূত্র ২৫
বিজ্ঞান পরিমাপক ৭৫
বিজ্ঞান বিষয়ক রোগ ৭
বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লেখিত
নির্দেশক ৭২
বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি ৬
বিজ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ ৬
বিদ্যায়তন গ্রন্থাগার ৪১
বিবলিওগ্রাফিক কাপলিং ৭২
বিবলিওমেট্রিক্স ২৫, ৭৪
বিভাজন ১৭
বিশাল বিজ্ঞান ৬
বিশেষ গ্রন্থাগার ৪১
বিশ্ব ২৯
বিশ্বকোষ ৪৩
বিষয় গ্রন্থ ৪৪
বিষয়বস্তু ৩১
বিষয়বস্তুর জগৎ ৩০
বিষয়বস্তুর প্রস্তুতিকরণ ৩১
বিষয়বস্তুর স্বাধীন সমাবেশ ৩১
বিষয়ের উৎসসন্ধানে উল্লেখিত
নির্দেশক ৭১
বিস্ফোরণ ৬
বুকস্টিন ৭৫
বুদ্ধিমত্তা ২২, ২৩
বেকনলাইট ১০
বৈষ্ণব পদাবলী ৪২
ব্যবচ্ছেদ ৩৩
ব্যাঙ্কা ১৪
ব্যাপক বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতি ৪৬
ব্রাডফোর্ড ৩৮, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৯
ব্রুক্স ৭৫, ৮০
ব্রুকের সংবর্গমান ছাঁচ ৮০

ভ

ভারত ১৬
ভারতের তথ্য বাবস্থা ২৮
ভিকারী ৭৫
ভুস ৭৪
ভূবিদ্যা ৫১
ভেনড়ুয়ান ৩
ভেনজুয়েলা ১৮
ভ্লোচ ৭৫

ম

মডেম ১০৫
মধ্যযুগ ১
মনোগ্রাফ ৪৪
মস্তিষ্কজাত ৪

মাইক্রো ডকুমেণ্ট ২৫, ৩৭, ৪২, ৩৮
মাইক্রোফরম ৩৯
মাইক্রোফিল্ম ৪৩
মাইক্রোফিস ৪৩
মাইক্রো মিলিনিয়াম ৪
মার্ক ৪০
মার্ক পোরাট ১৭
মার্টিনার টব ৫৯
মাধ্যমিক পত্রিকা ৪৫
মানবিক বৃত্তি ২২
মান্ডেল ব্রট ৭৫, ৮১
মিখাইল গিলজারভেস্কি ২৯
মিশ্র বিষয়বস্তু ৩১
মিশ্রিত পদ্ধতি ৪৭
মিসিংলিংক ৫১
মূল বিষয়বস্তু ৩১
মেডলার্স ২১, ৪০
মেডিকেল রিসার্চ ৮
মেমরি ১১৬
মেলভিল ভয়েট ১৯
মোরাভসিক ৭৫
ম্যাকলুহান ১৪
ম্যাগনেটিক টেপ ৩৯

য

যন্ত্রচালিত পাঞ্চকার্ড ৪২
যীশু ১
যুগলার ৩
যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা ১৯
যৌগিক বিষয়বস্তু ৩১
যৌথ গবেষণা ৩৯

র

রঙ্গনাথন ২৬, ২৭, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৯
রসায়ণ বিদ্যা ৩৮
রিকোয়েস্ট প্রোফাইল ৬৭
রূপ ৩২
রূপান্তর ৩৫
রইসিগ ৭৬
রেকর্ড ৪২
রেপ্রোগ্রাফী ২৭, ১০৭
রেফারেন্স সার্ভিস ২৪
রোবট ১৬
র‍্যাডার ৪৩

ল

ল অফ বিবলিওমেট্রিক্স ১৩৮
ল অফ স্ক্যাটারিং ৩৮
লক হিট ৮, ৪০
লক হিট ডায়লগ ৮
লাইব্রামেট্রিক্স ৭৫
লাইব্রেরী সায়েন্স উইথ এ স্ল্যান্ট টু ডকুমেন্টেশন ২৬
লিপিবদ্ধ নথি ৭৮
লুজ এ্যাসেমব্লেজ ৩২
লেমিনেশন ৩২, ৩৩
লোৎকা ৭৪
লোৎকার আঙ্কিক অনুশাসন ৭৮
লোৎকার বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের বিপরীত বর্গ অনুশাসন ৭৭

শ

শব্দাবলী ৫২
শিরোনাম নির্দেশক ৬১
শিল্প নৈপুণ্য ১৮
শেরা ২৪
শোপার্ড ৬৯

স

স্কার ১৩৯
স্কোর ১৩৯
স্টকব্রেকার ১৪
সংক্রামক সূত্র ২৫
সংক্ষিপ্তসার ২২, ৩৯
সংক্ষিপ্তসারকরণ ৭১
সংখ্যাতত্ত্ব ৫, ১৭, ৬৭, ৭৯
সংখ্যাতত্ত্বের ধর্ম ১৮
সংবাদপত্র ২১, ৪২
সংশ্লেষণ ৩০
সভ্যতা ৪
সমগ্র চাহিদা ২০
সমগ্র চাহিদার একত্রীকরণ ১৯
সমন্বয় সূচী ৫৮
সমাজবিজ্ঞান ৩৩
সমাজ ব্যবস্থা ১৮
সমাযোজন ৩৭, ৬৬, ৭৪
সমীকরণ ৭৮
সমীক্ষা ২৮
সমীক্ষাধর্মী ২২
সাইক্লোষ্টাইল ২০
সাইটেশন ইনডেক্স ৬৯
সাইটেশন ইনডেক্সের মাধ্যমিক ব্যবহার ৭০
সাইটেশন নির্দেশক ৬৯
সাইন্টোমেট্রিক্স ৭৫
সাধারণ গ্রন্হাগার ৪১
সাধারণ সাইটেশন ইনডেক্স ৭০

সার্ভিস টাইম ১২৫
সামগ্রিক চাহিদা ২২
সাময়িক পত্রপত্রিকা ৫, ১৯, ২১, ২২, ৩৭
স্যাটেলাইট ১৪
সি এ এস ২৮, ৪৫, ৪৬
সি সি ৩২
সিস্টেম্‌স্‌ এ্যানালিসিস ২৫, ৮৪
সুইডেন ১৮
সুচিন্তিত সমাজ ৪
সুর্মাপটার ৩
সূক্ষ্মতম অংশ ৫০
সূচীকরণ ২০, ২৪ ৬৬
সূচীপত্র পদ্ধতি ৪৬
সেনগদ্‌প্তজ থিয়োরী অফ বিব্লিওমেট্রিক্স ১১৮
সেনডক ৪০
সেণ্টাল প্রসেসিং ১১৬
সোর্স ইনডেক্স ৭০
স্কোলা ৬৯
স্তরমিলন ৩২
স্তরলেপন ৩২
স্পাইন্‌স্‌ ৪০
স্পেকুলেটর ১৪
স্পেশিয়েটর ৩৩
স্মৃতিভাণ্ডার ১১৬
স্লাইড ৪২

হ

হকিন্‌স ৭৬
হানসন ৪৩
হিউম ৭৫

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	শিশ্	শিষ্য
১	নতুর	নতুন
১১	Crouin	Cronin
১৮	Cromin Blarse	Cronin, Blaise
২৭	Expedition	Expeditions
৪৭	Tusearous	Thesaurus
৫৫	Operation	Operators
৫৫	Symantic	Semantic
৬৫	এইটি নির্দেশক	এই নির্দেশকটি
৬৫	নির্দেশককে	নির্দেশকে
৬৬	স্বাভাকিক	স্বাভাবিক
৭১	কোদ	কোন
৭৮	তনুশাসন	অনুশাসন
১০৯	রঙ	রড

দীপক কুমার রায়, এম. এ, ডিপ. লিব. (কলিকাতা) এম. এল. আই. এস. (বর্দ্ধমান)।

শ্রীরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী গ্রন্থাগারিক রূপে দীর্ঘ ২৯ বৎসর কর্মরত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল তথ্য পরিসেবার কাজে রত থাকিলেও তাঁহার কর্মকাণ্ড গ্রন্থাগারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা বিভাগে পরিক্রমার কার্যে তিনি নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখেন। ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর অবৈতনিক অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকের পদও অলংকৃত করেন। 'ইয়াসলিক্' ও মহীশূরের 'আকাদেমী অব ইনফরমেশন সায়েন্স' এর সদস্য শ্রীরায় 'Research in Librarianship and Technique of writing Research Results' বিষয়ে workshop-এ এবং L. C. C. পরিচালিত Basic Programming Language (Computer) বিষয়ে প্রশংসা পত্র লাভ করেন। বর্তমান গ্রন্থটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে Computer এর প্রয়োগ সম্পর্কিত এই প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানা পত্রপত্রিকার লেখক শ্রীরায় 'মুসলিম যুগের সংস্কৃতি' এবং স্বাধীনতা ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' এই দুই খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠক সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছেন।

পরিবেশক :
টীচার্স কনসার্ন
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯